# (ভারতের সংবিধান প্রণেতা)

# ডঃ [illegible]করের

সুভাষ কান্তি বড়ুয়া

# কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

**আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!**
**জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!**

This book is scanned by Sarbajit Bhante

(ভারতের সংবিধান প্রণেতা)

# ডঃ আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইতিবৃত্ত

সুভাষ কান্তি বড়ুয়া

# উৎসর্গ

ভারত ও বাংলাদেশে ডঃ
ভীমরাও রামজী আম্বেদকরের
লক্ষ লক্ষ বঞ্চিত, লাঞ্ছিত,
অবহেলিত, নির্যাতিত
শুভানুধ্যায়ী ও অনুসারীদের
উদ্দেশ্যে উৎসর্গীত হল।

গ্রন্থকার

(ভারতের সংবিধান প্রণেতা)

# ডঃ আম্বেদকরের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের ইতিবৃত্ত

সুভাষ কান্তি বড়ুয়া

**প্রকাশকাল**
প্রথম সংস্করণ
১৯৯৮ইং

**কম্পোজ ঃ** এসোসিয়েট নেটওয়ার্ক।
**ডিজাইন, প্রসেস ও মুদ্রণে ঃ** এসোসিয়েট প্রিন্টার্স (প্রাঃ) লিঃ
ঝাউতলা, কুমিল্লা। ফোন ঃ ৬১৫০

**প্রাপ্তিস্থান ঃ**
আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ বিহার
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা।

কনকস্তুপ বৌদ্ধ বিহার
ঠাকুরপাড়া, কুমিল্লা।

**মূল্য ঃ পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র।**

# পরিচায়িকা

ডঃ আম্বেদকর জন্মসূত্রে ছিলেন বর্ণ হিন্দুর ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য চাঁড়াল সন্তান। কিন্তু তিনি বিদ্যায়, বুদ্ধিতে ও ন্যায়বোধে ছিলেন বিশ শতকের ভারতে এক অনন্য পুরুষ। ঘৃণ্য, অস্পৃশ্য, শোষিত, পীড়িত, বঞ্চিত, প্রতারিত গণমানব মুক্তিই ছিল তাঁর স্বপ্ন, সাধ ও কর্ম জীবনের ব্রত। তাই তিনি হয়েছিলেন মুক্তিকামী গণ মানবের বল, ভক্তি ও ভরসার অবলম্বন "বাবা সাহেব"। ভারতের পনেরো কোটি অবমানিত, বঞ্চিত মানুষকে স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসী ছিলেন তিনি। যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগে লিখেছেন বহু গ্রন্থ ও প্রবন্ধ, আন্দোলনও করেছেন প্রায় একক ভাবে অভীকচিত্তে নিজের শক্তি সাহস প্রয়োগে। এজন্যে তিনি ছিলেন নির্যাতিত, নিগৃহীত, দুস্থ মানবতার মুক্তি সংগ্রামের প্রতীক, প্রতিম ও প্রতিভূ। ১৯৩০-৩২ সনের লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে যদি মুসলিমদের মতো তিনিও নিম্নবর্ণের হিন্দুদের জন্যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা আদায় করতে পারতেন তাহলে ভারতও হতনা দ্বি-খন্ডিত, বর্ণ হিন্দুরাও পেত না দিল্লীতে গদীর সুনিশ্চিত অধিকার। মহাত্মা গান্ধীর নিম্নবর্ণের হিন্দুর পৃথক নির্বাচন দাবির প্রতিরোধ লক্ষ্যে 'অনশননীতি' বরণ্যের উৎস তো এটিই। ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৮৯৩-১৯৫৬) মুখ্যত বর্ণ হিন্দুর স্বার্থ সচেতন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান কংগ্রেসের সুবিচারে আস্থা হারিয়ে প্রায় কয়েক লক্ষাধিক অনুসারী নিয়ে নিম্নবর্ণের, নিম্নবৃত্তির ও নিম্নবর্গের মানুষকে মৌলিক মানবিক অধিকারে স্বপ্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু তাতেও এ অস্পৃশ্য, ঘৃর্ণ্য মানব সমাজের স্বাধিকার আজো কার্যত স্বীকৃত হয়নি। তাই সংগ্রাম-আন্দোলন, দাংগা চলছে। তা সত্ত্বেও ভারতের দলিত সমাজ ক্রমে শিক্ষিত, সংহত, শক্তিমান ও সাহসী হয়ে উঠছে এবং মন্থরগতিতে আত্ম প্রতিষ্ঠার দিকে এগুচ্ছে।

সুভাষ কান্তি বড়ুয়া 'বাবা সাহেব আম্বেদকর' কে বাংলাদেশের জনসাধারনের মাঝে নিত্য স্মরণীয় করে রাখার লক্ষ্যে তাঁর (ডঃ আম্বেদকর) জীবন, মত, পথ ও কর্মের বৃত্তান্ত বয়ান করে মানববাদী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার ও ধন্যবাদের দাবিদার হয়েছেন।

ঢাকা, **ডঃ আহম্মদ শরীফ**

ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৯৮ইং।

# আমার কথা

যে উপমহাদেশ ছিল একদা বৌদ্ধ ধর্মের পীঠস্থান এবং যার পরিচিতি ছিল বৌদ্ধ ভারত নামে। নানাবিধ কারণে এ উপমহাদেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি লুপ্ত হয়ে গেছে বহু শতাব্দীকাল আগে। কিন্তু বৌদ্ধ সভ্যতা ও সংস্কৃতির অসংখ্য ধ্বংসস্তুপ ও অগনিত পাদপীঠ বা নির্দশন মাটি গর্ভ থেকে ক্রমে ক্রমে বের হয়ে এসে কালের নীরব সাক্ষী হয়ে সভ্য দুনিয়াকে জানান দিচ্ছে। অপরদিকে প্রাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এবং সেযুগে বর্হিবিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা একাধিক প্রামাণ্য চিত্রসমূহ উপমহাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম পুণর্বিকাশে সহায়ক হচ্ছে।

আধুনিক ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের নব উজ্জীবনে যে কয়জন মনীষির অবদান সর্বকালে স্মরণযোগ্য তাঁদের মধ্যে সিংহলের বিশিষ্ট পন্ডিত ভিক্ষু প্রয়াত অনাগরিক ধর্মপাল, বাংলার প্রাণপুরুষ কৃপাচরণ মহাস্থবির, পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেও এ ক্ষেত্রে ডঃ আম্বেদকরের স্থান সর্বাগ্রে। ভারতে যে কয়েক কোটি বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আছেন এদের সিংহভাগই ডঃ আম্বেদকরের অনুসারী যা নব্য বৌদ্ধ নামে অধিক পরিচিত। জীবনের প্রতি মুহূর্তে অস্পৃতার অনলে ক্ষত বিক্ষত আম্বেদকর বুদ্ধের সাম্য, মৈত্রী ও করুণার বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাম্যবাদের জোয়ারে সারা ভারতবর্ষকে প্লাবিত করে বুদ্ধযুগের সেই সমকালীন পর্যায়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁর ধর্মান্তর প্রক্রিয়া ছিল একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

ডঃ আম্বেদকর সম্পর্কে বিভিন্ন স্মরণিকা বা পত্র-পত্রিকা মারফৎ যতই যৎসামান্য অবগত হচ্ছি ততই যেন তাঁকে গভীরভাবে জানার ব্যাকুল আগ্রহে নেশাতুর হয়ে পড়ছি। শুধুমাত্র একজন ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ হিসেবে নয়, একজন সুপন্ডিত এবং ভারতবর্ষের কোটি কোটি দলিত, অস্পৃশ্য, নির্যাতিত, শোষিত, বঞ্চিত, উপেক্ষিত মানবকুলের এবং সমগ্র নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরাধা হিসেবেও। যাঁর আন্দোলন, সংগ্রামের উজ্জ্বলতায় অধিকার সমূহের অনেকাংশ বাস্তবে রূপায়নের সুযোগ এনে দেয়। তাঁর জীবনী ও কর্মকান্ডের উপর লিখিত বই-পত্র অনুসন্ধান করতে থাকি। বিগত কয়েক বছর যাবত জাতীয় গ্রন্থমেলা থেকে শুরু করে অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পন্ডিত মহলে তন্ন তন্ন করে অনুসন্ধান করেও তাঁর কোন জীবনী গ্রন্থ বা পুস্তিকাদি আবিস্কার করতে পারিনি(দীর্ঘ দিন পরে অবশ্য ডঃ আম্বেদকরের উপর লিখিত একটি স্মরণিকা ও একটি পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছিল)।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই লোকটি যিনি ছিলেন বিদ্যার অথৈই সাগর, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ, দক্ষ রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক, সংবিধান প্রণেতা, নির্যাতিত শ্রেণীর ত্রানকর্তা, মানবাধিকারের প্রবক্তা এবং সর্বোপরি আধুনিক ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের নব জাগরনের অন্যতম উদ্যোক্তা ডঃ আম্বেদকরের প্রতি আমাদের চরম উদাসীনতা বা দীনতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে কারনে তিনি এদেশের প্রবীণদের কাছে বিস্মৃত প্রায় আর নবীনদের কাছে তো একেবারেই অজ্ঞাত, অখ্যাত ও অপরিচিত থেকেই গেলেন। তাঁকে জানতে গিয়ে যে অভাববোধ আমার মধ্যে অনুভূত হয়েছিল তা পরবর্তীতে অধিকতর আবিস্কার এবং সর্বসাধারণ্যে তুলে ধরার দুর্বার আকাংখাই এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লেখার অবতারণা। এটাকে গ্রন্থ না বলে পুস্তিকা বলাই শ্রেয়। কারণ এই পুস্তিকার প্রতিটি শিরোনামই একেকটি বৃহদাকৃতির গ্রন্থ। সর্বসাধারনের ক্রয় ক্ষমতার কথা ভেবে পুস্তকের কলেবর অতি সংক্ষেপিত ফলে পুস্তকের অনেক বিষয়াদি পাঠকের কাছে অস্পষ্ট ও খাপছাড়া মনে হতে পারে। তবে এই স্বল্প পরিসরের আত্মজীবনীতে তাঁর জীবনের একাধিক ঘটনাবলী ও কার্যাবলীর আংশিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সুধী পাঠক সমাজে এই পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে বর্ধিত কলেবরে দ্বিতীয় সংস্করণ বের করার ইচ্ছে রইলো।

গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে যাঁর কাছে বেশী ঋণী তিনি হলেন ডঃ আম্বেদকরের জীবনী লেখক পশ্চিম বঙ্গের বাবু রনজিৎ কুমার সিকদার (ডঃ আম্বেদকর জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত '১৯৯০) এবং সহায়ক গ্রন্থ ও স্মরণিকা দিয়ে অন্যান্য যাঁরা আমাকে কৃতার্থ করেছেন তাঁরা হলেন- ভিক্ষু সুনন্দ প্রিয়, ঢাকা এবং ভিক্ষু বুদ্ধশ্রী, কুমিল্লা। তাছাড়া সহযোগিতা পেয়েছি কুমিল্লাস্থ কনকস্তূপ বৌদ্ধ বিহারের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ ধর্মরক্ষিত মহোদয়ের কাছ থেকে।

এই প্রথমবারের মত পুস্তকখানি প্রকাশ করতে গিয়ে কিছু ভুল ভ্রান্তি থেকে যেতে পারে যা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নিতে চেষ্টা করবো। পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকের পাঠ্য উপযোগী করে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় লিখিত হয়েছে। পুস্তকখানির মাধ্যমে অসামান্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী ডঃ আম্বেদকর সম্পর্কে এদেশের শোষিত, বঞ্চিত, নির্যাতিত লক্ষ লক্ষ আপামর জনসাধারণ এবং বৌদ্ধ জনগণের কাছে আংশিক পরিচিতিও যদি তুলে ধরতে পারি তাহলে নিজের পরিশ্রম খানিকটা লাঘব হয়েছে বলে মনে করবো।

কুমিল্লা,
ফেব্রুয়ারী ১৪, ১৯৯৮ইং।

**সুভাষ কান্তি বড়ুয়া (নেপাল)**

# সূচীপত্র


| | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১) | জাত ও বর্ণ ব্যবস্থা | ১০ |
| ২) | বাল্য ও কৈশোর | ১২ |
| ৩) | শিক্ষা ও দাম্পত্য জীবন | ১৪ |
| ৪) | আম্বেদকরের কর্মজীবন ও অন্যান্য কার্যাবলী | ২০ |
| ৫) | চৌদার পুকুর অভিযান ও আম্বেদকরের 'বাবা সাহেব' খ্যাতি অর্জন | ২৬ |
| ৬) | সাইমন কমিশনের রিপোর্ট | ৩০ |
| ৭) | অস্পৃশ্যদের শিক্ষা প্রসারে ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা | ৩২ |
| ৮) | মন্দির অভিযান | ৩৪ |
| ৯) | লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের তাৎপর্য | ৩৭ |
| ১০) | ঐতিহাসিক পুনা চুক্তি ও ফলাফল | ৪১ |
| ১১) | পত্নী বিয়োগ ও দ্বিতীয় বিবাহ | ৪৮ |
| ১২) | ইয়োলা সম্মেলন | ৫০ |
| ১৩) | ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব | ৫৩ |
| ১৪) | রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও মন্ত্রী থাকাকালীন গৃহীত কার্য্যাবলী | ৫৬ |
| ১৫) | সংবিধানের মূল স্থপতি ডঃ আম্বেদকর | ৬৩ |
| ১৬) | প্রথম সাধারণ নির্বাচন ও পার্লামেন্টে বিরোধী ভূমিকা | ৬৫ |
| ১৭) | হিন্দু কোড বিল ও মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ | ৬৮ |
| ১৮) | ধর্মান্তর পর্ব | ৭০ |
| ১৯) | জীবনাবসান | ৭৬ |

# জাত ও বর্ণ ব্যবস্থা

হাজার হাজার বছর ধরে গড়ে ওঠা জাত ও বর্ণ ব্যবস্থা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজে এক অভিশপ্ত নিয়মসিদ্ধ সামাজিক প্রথা। এটা ধাপে ধাপে যেমন সাজানো তেমনি পারস্পরিক অবিশ্বাস ও পাহাড়সম বৈষম্যের প্রাচীরে গড়া।

এই জাত/ বর্ণ ব্যবস্থায় তথাকথিত নীচুজাতের আদম সন্তানেরা তথাকথিত উঁচু জাতের মানব সন্তানদের সর্বাত্মক সেবাদানই নিয়তির বিধান বলে আজও কোটি কোটি হিন্দু ধর্মাবলম্বীর কাছে সুদৃঢ় ও বদ্ধমূল ধারনা। অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সেবার জন্য শুদ্রের জীবন ধারণ এবং তাদেরকে শ্রমদান শুদ্রের কর্তব্য।

"Anihilation of Caste" জাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি নামক ডঃ আম্বেদকর কর্তৃক লিখিত গ্রন্থটির বিষয়বস্তু হল- 'প্রথমদিকে হিন্দু সমাজের বর্ণ শ্রম ব্যবস্থা ধর্মভিত্তিক থাকলেও পরে তা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বার্থে জন্মভিত্তিকে পরিনত হল। ফলে বর্ণাশ্রম সমাজের শ্রমবিভাগ না হয়ে শ্রমিক বিভাগে রূপান্তরিত হয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানুষকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার পৈত্রিক পেশার মধ্যে নিবদ্ধ হতে বাধ্য করা হল। এতে মানুষের স্বাধীন ধর্মপ্রবৃত্তি আঘাতপ্রাপ্ত হল এবং বিশাল জনগোষ্ঠীকে শুদ্র, দলিত, অস্পৃশ্য ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করে শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও অস্ত্র বিদ্যা থেকে কৌশলে দূরে সরিয়ে রেখে এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতার উৎস থেকে বঞ্চিত করে তাদেরকে বংশানুক্রমিক দাসত্বের পাঁকে বন্দী করা হল।

সমাজের শ্রমজীবি মানুষ যাতে শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ এবং ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সমাজে তাদের মর্যাদা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে না পারে এ জন্য তাদেরকে উঁচু-নীচু, অর্থাৎ দলিত শ্রেণী, নিম্নবর্ণ, অস্পৃশ্য ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণে আখ্যায়িত করে স্বীয় কায়েমী

স্বার্থ উদ্ধারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার কৌশলই ছিল বর্ণবাদীদের এক নির্লজ্জ প্রয়াস। তারা শুধু বিশাল জনগোষ্ঠীকে অস্পৃশ্যতার কালিমা লেপন করে ক্ষান্ত হয়নি নারীদেরকেও করেছে ভোগ্যপণ্যের চেয়েও অধম। অস্পৃশ্য শ্রেণীর মত নারীরাও ছিল নিপীড়িত, নির্যাতিত, নিস্পেষিত, উপেক্ষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও নিগৃহীত। অসহায় দরিদ্র পরিবারের কিশোরী মেয়েদের দেবদাসী হিসেবে দেবালয়ে প্রেরণ ছিল সামাজিক প্রথার অংশবিশেষ।

তাছাড়া হিন্দু সমাজে বিবাহ ব্যবস্থাকে জাতি ও বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখার কারনে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের পেশাগত গুণাবলী-জ্ঞান, দৈহিকশক্তি, শারীরিক গড়ন/গঠন, অর্থনীতি ও সেবার সংমিশ্রনে কোন উন্নততর বংশধারা সৃষ্টিতে জাত বা বর্ণ ব্যবস্থা গুরুতর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজে জাত বা বর্ণ ব্যবস্থার শৃংখল এমনভাবে বাঁধা যে, তার বলয় থেকে মুক্তির কোন উপায় নেই। যদিও সময় বা সুযোগে এই শৃংখল ভেঙ্গে কেউ বেরিয়ে আসতে চাইলেই তাকে স্বার্থান্ধ গোষ্ঠীর কোপানলে পতিত হয়ে সমাজ বর্হিভূত বা বিভিন্ন অপদস্ত হতে হয়েছে বা হচ্ছে। ফলে হিন্দু সমাজ শতধা বিভক্ত হয়ে ক্রমশঃ দুর্বলতর হচ্ছে। এই শতধা বিভক্ত হিন্দু সমাজের দুর্বলতা ও শক্তিহীনতার সুযোগের কারনে যুগে যুগে ভারতবাসীকে বহিঃশত্রুর কাছে পদানত হতে হয়েছে।

ভারতবর্ষের দলিত, শ্রমজীবি, শোষিত ও অবহেলিত জনগোষ্ঠী বা নারী সমাজের মুক্তির জন্য চলতি শতাব্দীতে যিনি আমৃত্যু কঠোর সংগ্রাম করে গেছেন তিনি হলেন ডঃ বাবা সাহেব আম্বেদকর।

# বাল্য ও কৈশোর

সুবেদার রামজী শকপালকে চাকরীর কারনে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। তাঁর পৈত্রিক নিবাস তৎকালীন বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার আম্বাবাদ গ্রাম। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের সৈনিক পিতা মালোজী শকপালের একমাত্র পুত্র। রামজী শকপাল মধ্যপ্রদেশের "মোউ" শহরের সেনানিবাসে চাকরিকালীন সময়ে ১৮৯১ সালের ১৪ই এপ্রিল তাঁর গৃহআলোকিত করে এক পুত্র সন্তান জন্ম লাভ করলেন, যিনি পরবর্তীকালে ভারতীয় উপমহাদেশে উজ্জ্বল জোতিষ্ক হিসেবে আত্ম বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। রামজী শকপাল পুত্রের নাম রাখলেন ভীম সোমবেদকর। এমন একজন সন্তান প্রত্যাশায় ভীমের এক সন্ন্যাসী ঠাকুরদা নাকি ভবিষ্যৎবাণীও করেছিলেন যিনি পরবর্তীকালে দলিতদের মুক্তিদাতা হিসেবে ইতিহাস খ্যাত হয়ে উক্ত সন্ন্যাসীর ভবিষ্যৎ বাণীকে সত্যে পরিণত করেছিলেন।

আম্বেদকর হলো পাশ্ববর্তী এক গাঁয়ের নাম। স্কুল জীবনে প্রবেশের পর এক ব্রাহ্মণ শিক্ষক কৌতুহলবশতঃ সোমবেদ করের স্থলে ভীমের সাথে জুড়ে দেন আম্বেদকর। সেই থেকে ভীম সোমবেদকর হয়ে গেলেন আম্বেদকর নামে। আম্বেদকরের মাতার নাম ভীমাবাঈ। ১৪ সন্তানের এই জননী শেষ পর্যন্ত ৫ জন সন্তান সন্ততিকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেন। এদের মধ্যে তিন পুত্র ও দুই কন্যা। বলরাম, আনন্দরাও, মঞ্জুলা, তুলসী ও সর্বশেষ ভীম।

সামরিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক এই পিতা শুধু একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন না, ছিলেন ধর্ম পরায়নও, তাছাড়া তিনি একজন ক্রীড়ানুরাগীও ছিলেন। খেলা ধূলায় তার অনেক কৃতিত্ব ছিল। ১৯৮২ সালে ব্রিটিশ

সরকার কর্তৃক অস্পৃশ্য মাহারদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ বন্ধ করলে তিনি এর প্রতিবাদে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এতে করে তাঁর ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ও সামাজিক সচেতনতার পরিচয় বহন করছে।

এদিকে ভীমের মাতার পরিবারেরও দীর্ঘ পারিবারিক ঐতিহ্য রয়েছে। ভীমের মাতা ভীমাবাঈ ছিলেন থানা জেলার অন্তর্গত মুরবাদ গ্রামের বিখ্যাত মুরবাদকর পরিবারের কন্যা। ভীমাবাঈয়ের পিতা ও কাকারা ছিলেন সামরিক বাহিনীর চাকুরীজীবি। তারা সকলেই ছিলেন সুবেদার-মেজর। ভীমাবাঈ ছিলেন উজ্জ্বল গৌরবর্ণের ভক্তিমতী রমনী।

শৈশব থেকে আম্বেদকর উপলব্ধি করতে পারলেন তাঁর চতুর্পাশ্বেই বর্ণবৈষম্যের এক নিদারুন মর্মজ্বালা। এ প্রসংগে তাঁর ছেলে বেলার একটি ঘটনার বিবরণ সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করা হল। মহারাষ্ট্রের পাদালী রেলষ্টেশন থেকে একটি গরু গাড়ী চেপে কিশোর দুই ভাই আনন্দরাও ও আম্বেদকর রওনা হলেন পিতার সাক্ষাতে তাঁর কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে গাড়োয়ান জানতে পারল তার কিশোর যাত্রীদ্বয় অস্পৃশ্য সন্তান। এতে সে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের নামিয়ে দিল। গাড়োয়ানকে অনেক অনুনয় বিনয় করা হল। পরে দ্বিগুন ভাড়া কবুল করে বড় ভাই নিজেই গাড়ী চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগল আর গাড়োয়ান পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগল। এদিকে গ্রীষ্মের খরতপ্ত রৌদ্রে তেষ্টায় দুই কিশোরের জিব বের হয়ে আসছে। অনেকের কাছে পানীয় জল চেয়েও অস্পৃশ্যের সন্তান বলে জল কারও কাছে পাওয়া যায়নি।

এরিমধ্যে আম্বেদকরের মাতা ভীমাবাঈ ইহলোক ত্যাগ করলে তাঁর বাবা রামজী শকপাল পুনরায় বিয়ে করেন। তখন আম্বেদকরের বয়স ৪/৫ বৎসর। বাবার এই দ্বিতীয় বিয়ে তাঁর শিশুমনে প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি করে। এতে তিনি অধিকাংশ সময় পিসীর সাহচয্যে কাটাতেন। ভীমাবাঈয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভুত রামজীর একমাত্র বোন মীরাবাঈকে সংসার দেখাশুনার জন্য শ্বশুরবাড়ী থেকে নিয়ে এলেন। তিনি খুবই কর্মঠ ও সাংসারিক কাজে অভিজ্ঞ ছিলেন এবং মাতৃহারা দূরন্ত ভীমকে তিনি স্নেহডোরে বেঁধে রাখতেন।

# শিক্ষা ও দাম্পত্য জীবন

সামরিক বাহিনীর চাকরী থেকে রামজী শকপাল যখন অবসর নিচ্ছেন তখন ভীমের বয়স ছিল ২ বৎসর। পরে রামজী বোম্বাই প্রদেশের সাতারার সেনানিবাসে শিক্ষকতার চাকরী জোগাড় করে সেখানে পরিবার নিয়ে বসবাস শুরু করেন।

ভীমের প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষাজীবনও শুরু হয় সাতারাতে। বিশেষ করে স্কুল জীবন থেকে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথা তথা অস্পৃশ্যতার অভিশাপের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করলেন। ছাত্রজীবনের অপমানজনক দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার তাঁর সংবেদনশীল কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করে। যা পরবর্তীকালে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে তাঁর মনে প্রবল ঘৃণার সৃষ্টি হয়। যেমন- অস্পৃশ্যের সন্তান বলে স্কুলে বেঞ্চটুলের পরিবর্তে ছালার চটে বসতে দেয়া হত। ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা তাঁর বইখাতা স্পর্শ করতেন না, তাঁকে ক্লাসে কোন পড়া জিজ্ঞাসা করা হত না, এমনকি খড়িমাটি অপবিত্র হয়ে যাবে এই শংকায় তাকে বোর্ডে পর্যন্ত লিখতে দিতেন না। স্কুলে স্বহস্তে জল পান করতে পারতেন না। তাঁর মুখের উপর পাত্র উচু করে জল ঢেলে দেয়া হত। উঁচু বর্ণের সহপাঠিদের টিফিন বক্সগুলো তাঁর যাতে কোনরূপ ছোঁয়া না লাগে সেজন্য সাবধানে দূরে সরিয়ে রাখা ইত্যাদি ছাড়াও স্কুল জীবনের একাধিক নির্মম ঘটনা তাঁকে প্রতিনিয়ত দগ্ধ করেছিল।

বাল্যকাল বা স্কুল জীবন থেকে প্রতি পদক্ষেপে যে ভাবে তিনি সামাজিক বঞ্চনা, নির্যাতন ও অবহেলার শিকার হয়েছিলেন তখন থেকে তাঁর মধ্যে জীবনের প্রতিষ্ঠা পাবার স্বপ্ন জাগ্রত হয়েছিল। তাঁর জীবনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতাগুলো তাঁকে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে শক্তি যুগিয়েছে। যদিও এক সময় স্কুলে লাঞ্চনা, গঞ্জনার কারনে স্কুল এবং পড়াশুনার প্রতি তার ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মেছিল এবং কদাচিৎ পড়াশুনায় যেত তাছাড়া প্রায়শঃ

স্কুল পালাত। তবুও তিনি লক্ষ্যকে কখনো তাঁর দৃষ্টি থেকে ফিরিয়ে নেননি।

ইতিমধ্যে বাবার পুনরায় দার-পরিগ্রহের ঘটনা ভীমের মনে গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ভীম বিমাতাকে মোটেই সহ্য করতে পারছিলেন না। অথচ অদৃষ্টের পরিহাসে পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই স্ত্রী রমাবাঈয়ের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেছিলেন।

এই পরিস্থিতিতে তিনি স্বাধীন জীবিকার্জনের কথা চিন্তা করে বোম্বাইতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু সেখানে যেতে হলে অনেক টাকা পয়সার প্রয়োজন। তাঁর কাছে তো কোন টাকা নেই। অগত্যা পিসীমার কোমরে বাঁধা থলিটির দিকে ভীমের নজর পড়লে একদিন তা ভাগিয়ে নেয়। থলিটিতে প্রত্যাশিত পয়সা না পেয়ে ভীম হতাশ হয়ে পড়ে।

এই সময় তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। এই পরিবর্তনের কারনেই তিনি নিজেকে ডঃ আম্বেদকর হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কথায়- "ঠিক করলাম যে আমি স্কুল পালানোর অভ্যাস ত্যাগ করব এবং পড়াশুনার প্রতি গভীর ভাবে মনোনিবেশ করব, যাতে যত শ্রীঘ্র সম্ভব স্কুলের পাঠ সেরে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন শুরু করতে পারি।"

এদিকে রামজী শকপাল চাকরীর কারনে সপরিবারে বোম্বাই চলে এলেন। সেখানে ছোট্ট একটি ঘর ভাড়া নিলেন যা ৬/৭ জন সদস্যের পক্ষে কোনক্রমেই মাথাগোজা সম্ভব নয়। ভীমকে মারাঠা হাইস্কুলে ভর্তি করানো হলো এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক পিতার সযত্ন শিক্ষাদানে ভীমের পড়াশুনায় প্রভূত উন্নতি দেখা দিল। বিশেষ করে তাঁর ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান শিক্ষার ভিত্ খুব শক্ত হল। পিতা রামজী ভীমের পাঠস্পৃহা দেখে চরম অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার মধ্যেও তাঁর জন্য বিভিন্ন বই পত্র সংগ্রহ করে আনতেন।

ভীমের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ এবং উন্নতি লক্ষ্য করে বোম্বাইর বিখ্যাত স্কুল এলফিনষ্টোন হাইস্কুলে ভর্তি করানো হল। পড়াশুনার প্রতি তার আরও মনোযোগ বেড়ে গেল। কিন্তু যে পরিবেশের মধ্যে তাঁকে পড়াশুনা করতে হচ্ছে তা চিন্তা করলে সত্যিই অবাক হতে হয়। সবার জন্য একটি মাত্র ঘর। সেখানে রান্নাবান্না, থাকা খাওয়া, জ্বালানী কাঠের স্তুপ, ঘরের এক কোণে থাকত একটি ছাগলও। থাকার জায়গার অভাবে রামজী একটি

কৌশল বের করলেন। তা হল- সন্ধ্যার পর ভীম ঘুমাতে যেত এবং পিতা রামজী জেগে থেকে ভীমের পাঠ তৈরী করে নিতেন। রাত্রি দু'টো বাজলে তিনি ভীমকে জাগিয়ে ভীমের জায়গায় শুয়ে পড়তেন। ভীম সারা রাত্র ধরে নিরিবিলিতে পড়াশুনা করতেন।

একদিকে পারিবারিক অসুবিধা অন্যদিকে এলফিনষ্টোন হাইস্কুলের মত ঐতিহ্যবাহী স্কুলেও বর্ণ হিন্দু সহপাঠি ও শিক্ষকদের কাছ থেকে লাঞ্ছনার সম্মুখীন হতে হচ্ছিল। একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হয়। একদিন ক্লাসে জনৈক শিক্ষক তাকে বোর্ডে একটি প্রশ্নের সমাধান করতে বললেন। ভীম বোর্ডের দিকে এগুতেই বর্ণ হিন্দু ছাত্ররা চিৎকার করে ছুটে গিয়ে বোর্ডের পেছনে রাখা তাদের টিফিন বক্সগুলো এদিক ওদিক ছুড়ে ফেলতে লাগল। যেন ভীমের আগমনে তাদের টিফিন বক্সগুলো অপবিত্র হয়ে গেল। এ রকম অসংখ্য অপমানের ঘটনা তার বাল্য ও স্কুল জীবনের স্মৃতির ঝুলিতে ভরপুর। তবে ক্রিকেট ও ফুটবলে তার দক্ষতা থাকায় অনেক সহপাঠিদের মধ্যে তিনি স্থায়ী আসনও গড়ে নিতে পেরেছিলেন।

বর্ণহিন্দু ও শিক্ষকদের বিষোদ্গার সত্ত্বেও ১৯০৭ সালে এলফিনষ্টোন হাইস্কুল থেকে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। সে সময় একজন অস্পৃশ্য মাহার সম্প্রদায়ের কোন ছেলে প্রবেশিকা বা ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। এদিকে ভীমের কৃতিত্বের জন্য তাকে অভিনন্দন জানানোর উদ্দেশ্যে তার সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে একটি সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। এই সভায় পৌরাহিত্য করেন বিশিষ্ট সমাজ সংস্কারক এস,কে বোলে এবং সমাজ সেবী শিক্ষক অর্জুন কেলুশকার। তাঁরা উভয়েই ভীমের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন এবং উচ্চ শিক্ষার জন্য উৎসাহিত করেন। সেই সময় অর্জুন কেলুশকার প্রীতি উপহার হিসেবে "গৌতম বুদ্ধের" একখানি জীবনী গ্রন্থ ভীমের হাতে তুলে দেন। উক্ত বইখানি পরবর্তীকালে ভীমের পট পরিবর্তনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। পরে এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

তৎকালে অল্প বয়সে বিয়ের রেওয়াজ ছিল। তাই প্রবেশিকা পাশ করার পর ভীমের জন্যও বিয়ের আয়োজন করা হল। পাত্রী ৯ বৎসর বয়সী স্বগোত্রীয় মেয়ে রমাবাঈ। মাত্র ১৭ বৎসর বয়সে তার একান্ত অনিচ্ছা

সত্ত্বেও বাবা রামজী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলেন। এই বাল্য বিবাহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ভীম আইনের আশ্রয়ও নিয়েছিলেন। রমাবাঈয়ের পিতা ভিখু ওয়ালঙ্কর দাপোলীতে পোর্টারের কাজ করতেন। রমাবাঈ সৎ ও পতিপরায়না ছিলেন। স্বামীর লেখাপড়া ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে তার ত্যাগ ও দান ছিল অপরিসীম। এই রমনীর গর্ভে তাঁর তিনপুত্র ও এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। কন্যা ইন্দু শৈশবেই মারা গেল। একপুত্র রাজরত্ন ১৯৩৪ সালের জুলাই মাসে মারা যায়।

১৯১০ সালে এলফিনষ্টোন কলেজ থেকে আই,এ পাশ করার পর অর্থাভাবে তাঁর পড়াশুনা প্রায় বন্ধ হতে চলেছে। এই খবর তাঁর শুভানুধ্যায়ী অর্জুন কেলুশকরের কানে পৌঁছালে তিনি ভীমরাওকে নিয়ে বরোদার মহারাজা সয়াজিরাও গাইকোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করে যাবতীয় ঘটনা খুলে বলায় তিনি তাঁর উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থে যাবতীয় সাহায্য প্রদানে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন পূর্বক তাঁকে একই কলেজে বি,এ অধ্যয়ন করার খরচ জোগান। ১৯১২ সালে সেখান থেকে বি,এ পাশ করেন এবং এর পরের বৎসর ১৯১৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী পিতার মৃত্যু হয়। তাঁর জীবনের অন্যতম সহায়ক শক্তির উৎস পিতার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। না জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এই ব্যক্তিটি কিছুতেই দমিবার পাত্র নন। শৈশবের অপমান, নির্যাতন, অবজ্ঞা, অত্যাচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে অধিকার অর্জনের কঠোর সংগ্রামে তাঁকে সর্বদা তাড়িত করেছিল। এ শুধু নিজের অধিকার আদায়ের লড়াই নয়, শত সহস্র বছরকালব্যাপী নির্যাতিত, শোষিত, লাঞ্ছিত কোটি কোটি অস্পৃশ্যদের মানব সমাজে মানবের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও বাঁচার লড়াই করতে হবে এমনি একটি কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর সাথে যাঁরা বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থে, শক্তিতে, কুটনীতিতে, ধূর্ততায়, শঠতায়, হিংস্রতায়, ধর্মান্ধতায় অধিকতর শক্তিশালী। এদের সাথে লড়তে হলে প্রথমে নিজকেই যথোপযুক্ত ভাবে গড়ে তুলতে হবে। এই গড়ে তোলাটাই হচ্ছে যত বেশী সম্ভব জ্ঞান বলে বলীয়ান হওয়া।

এমন সময় একটা সুযোগও এসে গেল। বরোদার মহারাজা গাইকোয়ার কয়েকজন গরীব, অস্পৃশ্য মেধাবী ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার্থে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণে অর্থায়ন করছিলেন। বরোদার

মহারাজা ছিলেন জনদরদী ও দয়ালু লোক। অস্পৃশ্য ও গরীব মেধাবী ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষা লাভে সহায়তাদানের কথা তিনি ইতিপূর্বে বোম্বাইয়ের টাউন হলের এক সভায় ঘোষণা করেছিলেন। সুযোগ সন্ধানী আম্বেদকর এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। তিনি মহারাজার সাথে দেখা করে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে গমনের সমস্ত ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করলেন। অবশ্য মহারাজার সাথে আম্বেদকর অংগীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন যে আমেরিকা থেকে ফিরে এসে বরোদার মহারাজার অধীনে ১০ বৎসর চাকরী করবেন। উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে আম্বেদকর তাঁর জীবনের গৌরবজ্জল মুহূর্তগুলোতেও শুভানুধ্যায়ী শিক্ষক অর্জুন কেলুস্কর, মহারাজা গাইকোয়াড় ও সমাজ সংস্কারক জ্যোতিরাও ফুলে এই ৩জন পরম হিতৈষীর কথা আমৃত্যু শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে গেছেন।

গণতন্ত্রের অন্যতম প্রবর্তক আব্রাহাম লিঙ্কন ও জর্জ ওয়াশিংটনের দেশ আমেরিকায় পা দিয়ে তাঁর তথাকথিত অস্পৃশ্যতার সমস্ত কালিমা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বিহঙ্গের মত মুক্তাকাশে ডানা মেলে দিলেন। স্বদেশের মত প্রতিনিয়ত জাত, পাত, বর্ণ ও অস্পৃশ্যতার খাঁচায় সেখানে বন্দী হতে হচ্ছে না। সকলের সাথে একত্রে খেতে পারছেন, বসতে পারছেন, প্রাণ খুলে কথা বলতে পারছেন। এ যেন তাঁর কাছে এক নব স্বপ্নালোক।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর তিনি কঠোরভাবে পড়াশুনায় নিমগ্ন হলেন। তিনি বৃত্তির টাকা থেকে একটা অংশ সঞ্চয়ও করতেন। সেখানে তাঁর পাঠ্য বিষয় ছিল- রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, মানববিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান ও অর্থনীতি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক সেলিগম্যানের ছিলেন তিনি অতি প্রিয় ছাত্র।

তিনি ১৯১৫ সালে 'Ancient Indian Commerce' বিষয়ে অর্থনীতিতে এম,এ লাভ করেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে 'Natinonal Dividend of India-a Historic and Analytical Study বিষয়ে তাঁর লিখিত থিসিসের জন্য তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। এই থিসিসটি তিনি তাঁর হিতৈষী দয়াবান মহারাজার নামে উৎসর্গ করেন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বপূর্ণ সাফল্যের জন্য কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষকেরা তার সম্মানার্থে এক ভোজসভার আয়োজন করলেন।

পুনরায় উচ্চ শিক্ষার্থে বিলেত গমন করেন ১৯২০ সালের জুলাই মাসে। সেখানে 'London School of Economics and Political Science' কলেজে ভর্তি হন। সেখানে তাঁর গবেষণামূলক প্রবন্ধ 'Provincial Decentralisation of Imperial Finance in British India' বিষয়ের উপর M.Sc. ডিগ্রী লাভ করেন। লন্ডনে অধ্যয়নকালে তিনি বিশ্ববিখ্যাত ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে দৈনিক ১৬/১৮ ঘন্টা ধরে গভীর অধ্যয়নে নিমগ্ন থাকতেন।

১৯২২ সালে ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলেও অর্থাভাবে সে বারের গবেষণা কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

১৯২৩ সালে পুনরায় লন্ডনে ফিরে এসে 'The Problem of the Rupee' নামক প্রবন্ধের উপর গবেষণা কার্য চালিয়ে D.Sc উপাধি লাভ করেন। এরপর লন্ডনে ওকালতি শুরু করেন এবং সেখান থেকে Bar-at-Law ডিগ্রী লাভ করেন।

# আম্বেদকরের কর্মজীবন ও অন্যান্য কার্যাবলী

লন্ডনে ডি,এস,সি ডিগ্রী সমাপ্ত করার পর ১ম বিশ্ব যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অত্যন্ত বিপদ সংকুল অবস্থার মধ্যে জাহাজযোগে বিভিন্ন ঘুরপথে ১৯১৭ সালের ২৪শে আগষ্ট বোম্বাইতে পৌঁছান।

কয়েকদিন পর বরোদা ষ্টেটের সঙ্গে চুক্তি অনুসারে বরোদা যাবার কথা তিনি মহারাজাকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেন। বরোদার মহারাজা ডঃ আম্বেদকরকে স্টেশনে সম্বর্ধনা জানানোর জন্য তাঁর লোকজনকে নির্দেশ দিলেও অস্পৃশ্য এই লোকটিকে কেউই সম্বর্ধনা জানাতে এগিয়ে গেল না।

বরোদা স্টেটে তাঁর ১০ বছরের চাকরী করার অংগীকার ছিল। মহারাজা তাঁকে অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত নিলেন তৎপূর্বে অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রথমে সামরিক সচিব হিসেবে নিয়োগ দিলেন।

জীবনে প্রথম কর্মজীবনে প্রবেশ করেও বিশ্ববরেণ্য এই বিদ্বানকে অস্পৃশ্যতার সেই অভিশপ্ত অনলে দগ্ধ হতে হচ্ছে। অফিসের শিক্ষিত কর্মকর্তা থেকে শুরু করে পিওন পর্যন্ত কেউ তার সাথে কথা বলতো না, তাঁর ফাইল পত্র টেবিলের উপর ছুরে মারতো, অফিসে রক্ষিত পানীয় জল খেতে পারতেন না।

চাকুরীকালীন সময়ে থাকার কোন সুব্যবস্থা না থাকায় বংশ পরিচয় গোপন রেখে এক পার্সী হোটেলে অবস্থান করছিলেন। পার্সীদের কিছু লোকজন কয়দিন পরে জানতে পারল যে, তাদের হোটেলে অবস্থানকারী লোকটি একজন অস্পৃশ্য শ্রেণীভূক্ত। সে হিন্দু নয় তখন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। এরা দলবদ্ধ হয়ে লাঠি সোটা নিয়ে অপেক্ষা করছে। আম্বেদকর কর্মদিবস শেষে হোটেলের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বেই বিক্ষুদ্ধ পার্সী লোকজন কর্তৃক বাধাগ্রস্থ ও লাঞ্ছিত হন। তারপর তারা জোড় করে

তাকে সে স্থান ত্যাগ করতে বলল এবং তাঁর ব্যবহৃত জিনিস পত্র ও প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি ছুঁড়ে ফেলে দিল। প্রাশ্চাত্যের সুধীমহলে অভিনন্দিত সেদিনের এই কীর্তিমান ছাত্রকে আজ অশিক্ষিত, মুর্খ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকদের তাড়া খেয়ে নিরাশ্রিত হয়ে গাছতলায় বসে সারাদিন অশ্রুপাত করতে হয়েছিল। আর ভাবতে হয়েছিল অস্পৃশ্যরা কি হিন্দু?

আম্বেদকর মহারাজাকে বিস্তারিত জ্ঞাপনপূর্বক চিঠি লিখলেন। মহারাজা দেওয়ানকে এর বিহিত ব্যবস্থা করতে বললে দেওয়ান তার অক্ষমতার কথা মহারাজাকে জানিয়ে দিলেন। এর অল্প কয়দিন পরেই তিনি বোম্বাই ফিরে এলেন। এই ঘটনায় হিন্দু সমাজের জগণ্যতম রূপ তাঁর কাছে আরও স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হল। এই সময়ে ভারতে স্বায়ত্বশাসনের দাবী জোরদার হওয়ায় ভারত সচিব মন্টেগু ভারতের অবস্থা জানার জন্য আসেন। বিভিন্ন সংগঠন ও জাতি-গোষ্ঠী তার কাছে দাবী পেশ করছে। ঐ সময়ে বোম্বাইতে অস্পৃশ্যদের একটি সম্মেলন আহুত হয়। এতে উচ্চ বর্ণের লোকদের দ্বারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের বিরোধিতা করে অস্পৃশ্যদের দ্বারা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের দাবী জানানো হয়।

এর কয়েক মাস পরে অর্থাৎ ১৯১৮ সালের ২৩ ও ২৪শে মার্চ বোম্বাইতে ডিপ্রেস্‌ড ক্লাশেস মিশনের পক্ষে বরোদার মহারাজা সয়াজিয়া গাইকোয়ারের পৌরাহিত্যে একটি মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ভারতের অনেক নেতৃবর্গ উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে বালগঙ্গাধর তিলক বলেন যে, "অস্পৃশ্যতা হিন্দু সমাজের একটি মস্তবড় ব্যাধি এবং একে অবশ্যই দূর করতে হবে। স্বয়ং ভগবান অস্পৃশ্যতাকে সমর্থন করলেও তিনি করবেন না।"

মজার ব্যাপার হল- সম্মেলনের ইস্তাহারে যখন বলা হল, কোন নেতা তাদের দৈনন্দিন জীবনে অস্পৃশ্যতা মানবেন না, তখন তিলকই সেই ইস্তাহারে সই করলেন না। এই ধরনের দু'মুখো সর্পদের সাথে ডঃ আম্বেদকর কখনো আপোষকামী ছিলেন না।

এই সময়ে 'সিডেনহ্যাম কলেজ অব কমার্স এ্যান্ড ইকনমিক্স" কলেজে আইনের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রথমে বর্ণ হিন্দু ছাত্ররা তাঁর ক্লাশ বর্জন করলেও পরে বিদ্যার প্রখরতা ও তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কাছে ছাত্ররা হার মানে। সহকর্মী শিক্ষকরা তাঁর সাথে এক টেবিলে বসে চা পান ও গল্পগুজব করতেন না। ষ্টাফ রুমের কলসী থেকে জল পানের ক্ষেত্রেও তাদের আপত্তি ছিল।

ইতিমধ্যে ডঃ আম্বেদকরকে মন্টেগু চেম্বসফোর্ড রিফর্মস এর ভিত্তিতে নির্বাচন সম্পর্কে সাউথবরো কমিটিতে আমন্ত্রন জানালে তিনি স্পষ্টভাবে বলে দেন যে, নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য পৃথক নির্বাচন ও সংখ্যানুপাতে আসন সংরক্ষনের কথা।

নির্যাতিত শ্রেণীর রাজনৈতিক অধিকার প্রথম স্বীকৃত হয় ১৯১৯ সালের নতুন আইনে। উক্ত আইনে কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্যাতিত শ্রেণীর বেশ কিছু সংখ্যক সদস্য অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

এই সময়ে কোলাপুরের মহারাজা শাহু মহারাজ কর্তৃক অস্পৃশ্যদের শিক্ষার প্রসার এবং জাতিগত বিধিনিষেধের অবসানকল্পে আন্তরিক উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসলে অনেক অস্পৃশ্য সন্তানের চাকরী, বিনা খরচে পড়ার ও হোষ্টেলে থাকার সুযোগ ঘটে।

১৯২৬ সালে ডঃ আম্বেদকরের "মুক নায়ক" নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয় উক্ত মহারাজার অর্থানুকূল্যে। এই পত্রিকার প্রথম প্রকাশিত সংখ্যায় ডঃ আম্বেদকর হিন্দুধর্মীয় বৈষম্য নীতির কঠোর সমালোচনা করেন।

১৯২০ সালের মে মাসে নাগপুরে একটি সর্বভারতীয় অস্পৃশ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অস্পৃশ্যদের জন্য এটাই প্রথম সর্ব ভারতীয় সম্মেলন এবং তাদের দরদী বন্ধু শাহু মহারাজা এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে ডঃ আম্বেদকরের চেষ্টায় মাহারদের আঠারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে ভোজোৎসবের মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ মাহার সম্প্রদায় গড়ে তোলা হয়।

ঐ বছর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য "London School of Economics and Political Science College" এ ভর্তি হয়ে অসমাপ্ত পড়াশুনা সমাপ্ত করার জন্য পুনরায় লন্ডনে চলে যান। এ সময় তাঁর ঘনিষ্ট অনুগামী এস,এন, শিবতর্বরের উপর "মুক নায়ক" পত্রিকা চালাবার দায়িত্বভার ন্যস্ত করেন। তিনি শিবতর্করের কাছে সর্বদা পত্র যোগে অস্পৃশ্যদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়েতোলার উপর জোর দেন।

ডঃ আম্বেদকরের বিদেশী বন্ধু মিঃ নাভাল ভাথেনার আর্থিক সহযোগিতায় ব্যারিষ্টারী সনদ প্রাপ্ত হওয়ার পর স্বাধীনভাবে আইন ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আইন ব্যবসায়ে জড়িয়ে পড়েন। তিনি বোম্বাই হাইকোর্টে আপীল কেসের কাজ দেখাশুনা করতেন। সে সময় তিনি কোন বর্ণ হিন্দুর সহায়তা পাননি। ঐ সময় বোম্বাইতে নিত্য নতুন গড়ে ওঠা একাদিক বস্ত্রশিল্পে অনেক অস্পৃশ্য সন্তানের চাকরীর সংস্থান করেন। ফলে এদের মধ্যে একটি সাংগঠনিক মনোভাবও গড়ে ওঠেছিল যা আম্বেদকরের সৃষ্ট আন্দোলনে সহায়ক হয়েছিল।

অস্পৃশ্যদের অকৃত্রিম বন্ধু হিসেবে এস,কে বোলে নামের সমাজ সেবীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। তিনি আইন সভায় বলেন, - "আমরা দক্ষিণ আফ্রিকার কলোনীসমূহের বৈষম্যমূলক আচরণের নিন্দা করছি। তার আগে আমাদের নিজেদের বৈষম্যমূলক আচরনের মূলোৎপাটন করতে হবে। তিনি আইন সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করান তা'হলো পুকুর জলাশয়ে, বিদ্যালয়ে, হাসপাতালে, সরকারী অফিস, কোট কাচারীতে নির্যাতিতদের সমানাধিকার থাকবে। এই প্রস্তাবের কারনে তিনি অভিনন্দনস্বরূপ অস্পৃশ্যদের কাছ থেকে একটি স্বর্ণপদক পুরস্কৃত হয়েছিলেন।

গান্ধিজী খেলাফত আন্দোলনে যোগ দিয়ে রাজনীতিতে মার খাওয়ার পর ১৯২৪ সালে 'হরিজন' কল্যাণে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন। এটাকে ডঃ আম্বেদকর বুঝেছিলেন- এর পেছনে অস্পৃশ্যদের কল্যাণের চেয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটাই প্রধান। ১৯২৪ সালে ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের উপর চাপিয়ে দেয়া বাধা নিষেধ দূর করার প্রয়াসে কেন্দ্রীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করার উদ্দেশ্যে একটি সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তানুযায়ী

স্যার চিমনলাল শীতলবাদকে সভাপতি করে ২৯শে জুলাই "বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা" নামে একটি সমিতি গঠিত হয়।

এই সভার মাধ্যমে ১৯২৫ সালের ৪ঠা জানুয়ারী সোলাপুরে অস্পৃশ্য ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। সে সময় ছাত্রদের দ্বারা 'স্বরসতী বিলাস' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করা হয় এবং ফ্রি রিডিং রুম স্থাপিত হয়। খেলাধূলার জগতে এগিয়ে আসার ব্যাপারে অস্পৃশ্যদের জন্য "মাহার হকি ক্লাব' গঠিত হয়। ডঃ আম্বেদকরের আন্দোলনের ঢেউ দক্ষিণ ভারতে তোলপাড়সহ ভারতের অন্যান্য প্রান্তে যখন আছড়ে পড়ছে। তখন ত্রিবাঙকুর রাজ্যে ভাইকমের সত্যাগ্রহ পালন নির্যাতিতদের আন্দোলনের ইতিহাসে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। নাইকারের নেতৃত্বে একটি নিষিদ্ধ রাস্তায় অস্পৃশ্যদের যাতায়াতের অধিকার লাভের জন্য এই সত্যাগ্রহ পালনের মধ্য দিয়ে রাস্তাটি অস্পৃশ্যদের চলাচলের ক্ষেত্রে বাধা অপসারন করতে সক্ষম হয়।

১৯২৬ সালে মার্চ মাসে মাদ্রাজে সংগঠিত আর একটি ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে দেশব্যাপী উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। মুর্গেসন নামক একজন অস্পৃশ্য যুবক তাদের জন্য নিষিদ্ধ মন্দিরে ঢুকে পড়লে তাকে ধরে মন্দির অপবিত্র করার দায়ে দন্ডিত করা হয়।

ডঃ আম্বেদকর উপরোক্ত ঘটনাবলী গভীরভাবে পর্যবেক্ষন করতঃ তার 'মুক-নায়ক' পত্রিকার সম্পাদকীয়তে ফলাও করে ছাপাতে থাকলে আন্দোলনের তীব্রতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এদিকে আইন ব্যবসায়েও আম্বেদকরের সুনাম সারা দেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। ঐ সময় পুনার কিছু সংখ্যক অব্রাহ্মণ নেতা কর্তৃক 'ব্রাহ্মণেরাই ভারত ধ্বংসের জন্য দায়ী' বলে অভিযোগ পূর্বক পুস্তিকাকারে বের করে জন সাধারন্যে বন্টন করতে থাকে। পুনার কতিপয় ব্রাহ্মণ উক্ত নেতাদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযোগ তুলে আদালতে মামলা দায়ের করে। আম্বেদকর আসামী পক্ষের ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হয়ে যুক্তিসংগত আইনানুগ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে আসামীদেরকে উক্ত মামলা থেকে খারিজ করেন। এই বিতর্কিত মামলায় জয় লাভের কারনে তিনি বোম্বাই কোর্টে প্রথম শ্রেণীর আইনবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখ্য যে, বর্ণাশ্রম ধর্মের একনিষ্ঠ সমর্থক গান্ধীর এই মতবাদ ছিল জোড়াতালি দেয়া ব্যাপার। বর্ণহিন্দু কর্তৃক অস্পৃশ্যদের প্রতি অবজ্ঞা নিষ্ঠুরতা ও তাদের অবর্ণনীয় দুর্দশাগ্রস্থ অর্থনৈতিক অবস্থা যদি গান্ধীর হৃদয়ে সহানুভূতির সৃষ্টি করে তাহলে এগুলোর পৃষ্ঠপোষক বিত্তশালী গোড়া হিন্দুদের সমস্ত অন্যায় সযত্নে লালন করার প্রয়াস কেন? এতে বুঝা যায়, হরিজন আন্দোলনের পুরাধা করম চাঁদ গান্ধী হিন্দু সমাজের সামগ্রিক সংস্কারের চিন্তা কখনো করেননি। এক্ষেত্রে বীর সাভারকর অনেক প্রগতিশীল ও উদারতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন জাতিভেদ প্রথার বিলোপসাধন করে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমান অধিকারের ভিত্তিতে নতুন করে হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করতে।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের কাতারে নিয়ে যেতে নিম্নোক্ত তিনটি মূলমন্ত্রকে বেছে নিয়েছিল। আত্ম নির্ভরতা, আত্ম উন্নয়ন ও আত্মসম্মান। তাঁর জ্বালাময়ী ও উদ্দীপনামূলক বক্তৃতা অস্পৃশ্যদের মনে এক অভূতপূর্ব আত্ম প্রত্যয়ের সৃষ্টি করতো। তাঁর বক্তৃতার ভাষা যেমন যুক্তিগ্রাহ্য তেমনি প্রাঞ্জল ও শ্রুতিমধুর। যেমন- 'আমাদেরও জন্মভূমির উপর অন্যান্যদের ন্যায় সমান অধিকার রয়েছে, যে অধিকার থেকে আমাদের সহস্র সহস্র বছর ধরে বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে। আজ মরনপণ সংগ্রাম করেও সে অধিকার আমাদের আদায় করে নিতে হবে।'

অনেকে হয়তো অভিযোগ করেন যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ডঃ আম্বেদকরের উল্লেখযোগ্য কোন ভূমিকা নেই। এ প্রসংগে তাঁর ভাষার পূনরাবৃত্তি করতে হয়, 'আগে নিজেকে জাগ্রত করতে হবে। যারা মানুষ হয়েও সমাজে পশুর চেয়ে অধম, যুগ যুগান্তরে সমাজের প্রাণপন সেবা করেও হিন্দু সমাজের যে সব ধূর্ত ও প্রবঞ্চকের দল তাদের শত সহস্র বছরকাল অস্পৃশ্যতার মালা পড়িয়ে কুকুর বিড়ালের চেয়েও বেশী ঘৃণা করে এসেছে সেই সমস্ত মানুষদের প্রথম প্রয়োজন মানুষের অধিকার লাভ। অন্যথায় তাদের জীবনে রাজনৈতিক স্বাধীনতার কোন ভিত্তি নেই।"

# চৌদার পুকুর অভিযান ও আম্বেদকরের 'বাবা সাহেব' খ্যাতি অর্জন

১৯২৩ সালের 'বোলে প্রস্তাব' অনুসারে মাহাদ মিউনিসিপালিটি ১৯২৪ সালে চৌদারপুকুর অস্পৃশ্যদের জন্য মুক্ত করা হবে বলে ঘোষণা প্রকাশ করল। লক্ষনীয় যে, মুসলমান ও খৃষ্টানেরা এই পুকুরের জল অবাধে ব্যবহার করলেও অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে ছিল বাধা নিষেধ। মাহাদ মিউনিসিপালিটির ঘোষণাও যেন কাগুজে ঘোষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল।

এদিকে আম্বেদকরের নেতৃত্বে কোলারা জেলার নির্যাতিতদের সংগঠন ১৯২৭ সালের ১৯ ও ২০শে মার্চ মাহাদে একটি সম্মেলন করবে এবং সম্মেলনের পর চৌদার পুকুরের জল স্পর্শ পূর্বক শত শত বছরের আরোপিত বিধি নিষেধের দেওয়াল ভেঙ্গে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়।

যথারীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন জেলা থেকে দশ হাজারের মত প্রতিনিধি এবং কিছু উদারমনা বর্ণহিন্দু ও এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই সম্মেলনে ডঃ আম্বেদকর জ্বালাময়ী বক্তৃতায় বলেন,- 'আমরা যদি নিজেদের মর্যাদা নিজেরা সৃষ্টি করতে না পরি কেউই আমাদের মর্যদা দেবে না এবং পদে পদে অপমান ও ঘৃণা করবে। আমাদের প্রত্যেককে শিক্ষাগ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যৎ বংশধরদের যদি আমাদের চেয়ে উন্নতস্তরে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা না করি তবে আমাদের সঙ্গে পশুদের পার্থক্য কোথায়?'

১৯২৪ সালে গৃহীত বোলে প্রস্তাবসমূহ অলিম্বে বাস্তবায়নে সরকারী দৃষ্টি আকর্ষনের প্রস্তাব রাখা হয়।

দ্বিতীয় দিনের সম্মেলন শেষে প্রতিনিধিগণ এক বিরাট শোভাযাত্রা নিয়ে 'চৌদার পুকুর' অভিমুখে যান। ডঃ আম্বেদকর প্রথম পুকুরের জল

স্পর্শ ও পান করে অস্পৃশ্যদের হাজার বছরের অনধিকার ভেঙ্গে দেন। সাথে সাথে সহস্র মানুষের জয়ধ্বনিতে পুকুর প্রাংগণ মুখরিত হয়ে ওঠে এবং নির্যাতিত শ্রেণীর হাজার হাজার জনতা সমস্বরে ডঃ আম্বেদকরকে 'বাবা সাহেব' বলে আখ্যায়িত করেন। এরপর জনতা আনন্দ মিছিল নিয়ে নিকটবর্তী বীরেশ্বর প্যান্ডেলে ফিরে আসেন।

এদিকে কুচক্রী বর্ণ বর্ণহিন্দুরা অপপ্রচার করতে লাগল যে, অস্পৃশ্যরা শুধু পুকুরের জলই অপবিত্র করে নাই তারা বীরেশ্বরের মন্দিরও অপবিত্র করতে আসছে এবং তাদের প্ররোচনায় একদল হামলাবাজ অতর্কিতে প্যান্ডেল আক্রমন করে বসে। এই হামলার খবর ডাক বাংলোতে অবস্থানরত ডঃ আম্বেদকরের কানে পৌঁছলে তিনি দ্রুত পুলিশ কর্তৃপক্ষকে প্রতিহত করার জন্য আহবান জানিয়ে কয়েকজন সহচরকে নিয়ে প্যান্ডেল অভিমুখে ছুটে এসে হামলাকারীদের উদ্দেশ্যে জানালেন, মন্দির অভিযানের কোন পরিকল্পনা তাদের নেই। এমন সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অন্যান্য নেতৃবর্গ ও অস্পৃশ্য সাধারণ জনগন তাদের প্রিয় নেতার সামনে এসে পাল্টা হামলা চালাবার নির্দেশ দানের জন্য আবেদন জানালে তিনি তাদেরকে আইনানুগ ব্যবস্থায় হামলাকারীদের বিরুদ্ধে বিহিত ব্যবস্থা করবেন বলে আস্বস্ত করেন। প্রিয় নেতার আহবানে উত্তেজিত অস্পৃশ্য জনতার দল নীরব হয়ে যায়।

পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে কতিপয় দুর্বৃত্তকে গ্রেফতার করে। এদের ৫ জনকে বার মাসের কারাদন্ডে দন্ডিত করা হয়। হামলাকারীদের সশ্রম কারাদন্ড, মাহাদ সম্মেলন এবং চৌদার পুকুর অভিযান ইত্যাদি ঘটনাগুলো নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষের মনে নব চেতনা ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল। চৌদারপুকুর অভিযানের পরে প্রতিনিধিদের উপর বর্ণ হিন্দুদের ভাড়াটিয়া গুন্ডা কর্তৃক হামলার ঘটনা ভারতের প্রায় সংবাদ পত্রে গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হলে সারা ভারতে তা দাবানলের ন্যায় অস্পৃশ্যদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এতে হিন্দু সমাজে সংস্কারের আন্দোলন আরও বেগবান হয়ে উঠে।

এদিকে বর্ণহিন্দুরাও নানা অপ্রচার ও উস্কানি সৃষ্টি করতে লাগল। অস্পৃশ্যদের হিন্দু পল্লীতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হল। তাদের কাছে পন্য সামগ্রী বেচাকেনা বন্ধ করল এবং বর্গা দেয়া জমি ফিরিয়ে নেয়া হল। এতে করে অস্পৃশ্যরা আরও সংঘবদ্ধ হতে লাগল।

এর ফলে দেশের সাংবাদিক বুদ্ধিজীবি ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের

মধ্যে দুইশিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ল। আবার অনেকেই মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে লাগলেন। কেউ কেউ আম্বেদকরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। এদের মধ্যে বীর সাভারকরের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বীর সাভারকর বল্লেন- 'অস্পৃশ্যতা দূরীকরন শুধু যুগোপযোগী নীতি বা কর্তব্য হিসাবেই নয়, মনুষ্যত্বের ন্যায় বিচার ও হিন্দু ধর্মের বৃহত্তর স্বার্থের জন্যও অবিলম্বে এ ব্যাধির অপসারণ করা দরকার। গোবর ও গোমূত্র নামক পশুমল দ্বারা পবিত্রকরনের হিন্দু ব্যবস্থার ঘৃণ্য ও হাস্যকর বিধান থেকে হিন্দু ধর্মকে মুক্ত করা প্রয়োজন।'

মাহাদ মিউনিসিপালিটি কর্তৃক চৌদারপুকুরটিকে অস্পৃশ্যদের কাছে উন্মুক্ত রাখার ১৯২৪ সালের প্রস্তাবটি পুনরায় ১৯২৭ সালে ৪ঠা আগষ্ট এক অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে প্রত্যাহার করে নেওয়ায় ডঃ আম্বেদকরের জন্য এক চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দেয়। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৯২৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের দামোদর হলে তিনি এক বিশাল জনসভার আয়োজন করেন। এতে মাহাদ মিউনিসিপালিটির অবৈধ প্রস্তাবের তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে এই অন্যায় আদেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া ২৫ ও ২৬শে ডিসেম্বর চৌদার পুকুরে সত্যাগ্রহ পালনেরও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

এ সময়ের ৩রা এপ্রিল থেকে আম্বেদকরের সম্পাদনায় "বহিষ্কৃত ভারত' নামে একটি মারাঠি পাক্ষিক পত্রিকা বের করেন। এই পত্রিকার সম্পাদকীয়তে তীক্ষ্মযুক্তি ও জোড়ালো ভাষায় গোড়া বর্ণহিন্দুদের কর্তৃক অস্পৃশ্যদের উপর নির্যাতনের কাহিনী গোটা হিন্দু সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবার প্রক্রিয়াকে দোষারোপ করে দেশবাসীর সমক্ষে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। তিনি প্রশ্ন রাখেন- অস্পৃশ্যরা হিন্দু কিনা? যদি হিন্দু হয় তাহলে তাদের স্পর্শে হিন্দু মন্দির বা পুকুরের জল অপবিত্র হবে কেন?

ডঃ আম্বেদকরের লক্ষ্য হল- মূল হিন্দু ধর্মকে স্বার্থান্বেষী গোঁড়া, অন্ধ ও মানবতাবিরোধী বর্ণহিন্দুদের হাত থেকে উদ্ধার করে সমগ্র হিন্দুদের মধ্যে সমনাধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এই মহতী উদ্দেশ্যে তারা সত্যাগ্রহ পালনের সিদ্ধান্ত নেন।

'চৌদার পুকুর' প্রাঙ্গনে সত্যাগ্রহের দিন যতই এগিয়ে আসছে

গোঁড়া বর্ণ হিন্দুরাও সত্যাগ্রহকে বানচাল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছে। তারা ২৭শে নভেম্বর বীরেশ্বরের মন্দিরে এক সভা আহবান করে। উদার পন্থীদের একটি অংশ সত্যাগ্রহের নৈতিক দিকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং অপর অংশ সত্যাগ্রহ পরিচালনার উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে (ডঃ আম্বেদকর, কৃষ্ণজীকদম, শিবতর্কর, মানু চাম্বার প্রমুখ) আদালতে মামলা দায়ের করলে কোর্ট তাঁদের উপর ইনজাংশন জারী করে।

২৫শে ডিসেম্বর বিকাল -৪ঃ৩০ মিনিটে সত্যাগ্রহীদের সম্মেলন শুরু হয়। এই সম্মেলনে ১৫ সহস্র সত্যাগ্রহী যোগ দিয়েছিলেন। এতে অধিকাংশ নেতা সত্যাগ্রহ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে মতামত ব্যক্ত করলেও ৪জন শীর্ষস্থানীয় নেতা আপাততঃ সত্যাগ্রহ স্থগিত রাখার পক্ষে মত দেন।

যা'হোক সম্মেলনের প্রথমে মানবাধিকারের এক সনদপত্র পাশ করান হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল এই সম্মেলনে হিন্দুধর্মের পবিত্র গ্রন্থ মনুস্মৃতির প্রজ্জলন সংক্রান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে সহস্রবুদ্ধে, রাজভোজ ও মেরাট জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। বোম্বাই থেকে আগত দুইজন অব্রাহ্মণ হিন্দু নেতা জেধে ও জাভাল করও অস্পৃশ্যদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে আন্তরিক সমর্থন জানান।

ডঃ আম্বেদকর বলেন, 'মুনসংহিতাকে' হিন্দু ধর্মের আচরন বিধির পবিত্র গ্রন্থরূপে গণ্য করা হয়। মনুস্মৃতিকে ব্রাহ্মণ জগদ্বীশ্বর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, শুদ্রের সম্পদ অর্জনকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে এবং ব্রাহ্মণেরা শুদ্রের সম্পত্তির ন্যায়সঙ্গত অধিকারী বলে স্বীকৃত হয়েছে। যে কোন বর্ণের নারী ব্রাহ্মণদের উপভোগের বস্তু। গ্রন্থটি ব্রাহ্মণ্যবাদের কালাকানুন এবং সভ্যসমাজের কলঙ্ক। কাজেই গ্রন্থটিকে অবিলম্বে ভস্মীভূত করা প্রয়োজন।'

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে ২৫শে ডিসেম্বর রাত্রি ৯টায় প্যান্ডেলের সম্মুখভাগে সোচ্চার ধিক্কার ও বিপুল আনন্দধ্বনির মধ্য দিয়ে সর্বসমক্ষে 'মনুস্মৃতির' বহ্ন্যুৎসব করা হয়।

সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার জন্য সত্যাগ্রহী নেতৃবৃন্দের কাছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ২৭ শে ডিসেম্বর সকাল বেলা সত্যাগ্রহ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কারণ কয়েকজন ব্যক্তি পুকুরটি তাদের

ব্যক্তিগত দাবী করে কোর্টে কাগজপত্র দাখিল করে। তাই কোর্ট কর্তৃক পুকুরটি সর্বসাধারণের সম্পত্তি হিসেবে প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে সত্যাগ্রহ মূলতবী রাখার জন্য তিনি (আম্বেদকর) সত্যাগ্রহীদের অনুরোধ জানান। এতে সত্যাগ্রহীদের এক বিশাল অংশ শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করে সারা শহর ও চৌদার পুকুর প্রদক্ষিন করে প্যান্ডেলে ফিরে আসে।

ডঃ আম্বেদকর পরে নির্যাতিত শ্রেণীর কয়েক হাজার মহিলার এক সমাবেশে ভাষণদান করেন।

পরবর্তী তিন বছর ধরে চলা চৌদার পুকুরের মামলায় অস্পৃশ্যরা জয় লাভ করে। মাহাদ আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে অল্প সময়ের মধ্যে ডঃ আম্বেদকরের পক্ষে সারা ভারতে তফসীলি আন্দোলন গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল।

## সাইমন কমিশনের রিপোর্ট

স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ৭ সদস্যের একটি বৃটিশ প্রতিনিধি দল ১৯২৮ সালের প্রথম সপ্তাহে ভারতের সমস্যাবলী সমীক্ষা করার জন্য বোম্বাই আসে। এই কমিশন 'সাইমন কমিশন' নামে পরিচিত। এই দলে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভূক্ত না করায় ভারতীয় কোন রাজনৈতিক দলই এই কমিশনকে স্বাগত জানাননি।

এই সময় কংগ্রেস কর্তৃক হিন্দু, মুসলমান, পার্সী, শিখ, দ্রাবিড় ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সর্ব ভারতীয় সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে নির্যাতিত শ্রেণীর কোন প্রতিনিধিকে আমন্ত্রন জানানো হয়নি।

সাইমন কমিশনের কাজে সহায়তা করার জন্য আইন সভার সদস্যদের নিয়ে প্রত্যেক প্রদেশের গঠিত কমিটিতে বোম্বাই থেকে আম্বেদকর মনোনীত হন। নির্যাতিত শ্রেণীর ১৬টি সংস্থা সাইমন কমিশনের কাছে পৃথক নির্বাচনের দাবী জানায়।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর নব গঠিত 'বহিস্কৃত হিতকারিনী সভা'র পক্ষ থেকে সংরক্ষিত আসনে যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা এবং বোম্বাই আইন সভায়

১৪০টি আসনের মধ্যে নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য ২২টি আসন দাবী করেন। শেষাবধি ডঃ আম্বেদকর কমিশনের সাথে ঐকমত্যে আসতে না পেরে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণ ও ঐক্যের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করে আলাদাভাবে রিপোর্ট পেশ করেন। এই রিপোর্ট প্রকাশিত হবার পর তিনি সত্যিকার দেশ প্রেমিক ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ হিসেবে পরিচিতি পান।

সাইমন কমিশনের রিপোর্টে দেখা যায়, হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। কেন্দ্রীয় আইন সভার ২৫০টি আসনের মধ্যে নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধিসহ হিন্দুদের শতকরা ৬০ ভাগ দেয়া হয়। নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হলেও গভর্ণরের সার্টিফিকেট ব্যতীত এই শ্রেণীর কোন প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না বলে জানিয়ে দেয়া হয়। সাইমন কমিশনের এই সিদ্ধান্তে ডঃ আম্বেদকর তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেন।

১৯৩০ সালের আগষ্ট মাসে আম্বেদকরের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় নির্যাতিতদের নিয়ে নাগপুরে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে তিনি বলেন- জাতিধর্ম নির্বিশেষে অখন্ড জাতীয়তাবোধের মাধ্যমে ভারতীয়দের পক্ষে স্বাধীন সরকার গঠন সম্ভব। তবে সংবিধান তৈরীকালীন সময়ে বিভিন্ন জাতির সুবিধা অসুবিধার দিক্‌সমূহ বিবেচনার দাবী রাখে। তিনি আরও বলেন- একদেশের উপর অন্য দেশের শাসন যেমন বরদাস্ত করা যায় না তেমনি কোন জাতি বা শ্রেণীর শাসনকে ভাল বলে মেনে নেওয়া যায় না।

গান্ধিজীর ইংরেজ আইন অমান্য আন্দোলন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে ডঃ আম্বেদকর বলেছেন। আইন অমান্য আন্দোলন সফল হলে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তর ঘটাতে পারে এতে করে হাজার হাজার বছরের সামাজিক বৈষম্য ও নির্যাতনের পরিসমাপ্তি হবে কিনা। যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের সাথে সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে আশু পদক্ষেপ নেয়া হয় তাহলে তিনি এ ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবেন। ভারতের অসংখ্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে একমাত্র ডঃ আম্বেদকরই রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তরের চেয়ে ভারতের সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক পরিবর্তনে সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছিলেন। এতে করে ভারতের বঞ্চিত, নির্যাতিত নিপীড়িতদের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালবাসা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি তাঁর গভীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচয়ও বহন করেছে।

# অস্পৃশ্যদের শিক্ষা প্রসারে ডঃ আম্বেদকরের ভূমিকা

ডঃ আম্বেদকর জীবনের লব্ধ অভিজ্ঞতা থেকে এই কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, নিজ সমাজের এই চরম দূরাবস্থার জন্য শিক্ষা ও জ্ঞানের অভাবই সবচেয়ে দায়ী। তাই তিনি নির্যাতিত শ্রেণীর মাঝে শিক্ষা বিস্তারে আপ্রান চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২৮ সালে 'ডিপ্রেসড ক্লাশেস এডুকেশন সোসাইটি' গঠিত হয়। অতঃপর বোম্বাই সরকারের কাছে এই সোসাইটিকে সাহায্যের আবেদন জানান। সোসাইটির কাজ কর্মে আন্তরিকতা ও সততার কারনে নির্যাতিত শ্রেণীর ৫টি ছাত্রাবাস পরিচালনার দায়িত্ব এই সোসাইটির হাতে বোম্বাই সরকার কর্তৃক ন্যস্ত করা হয় কিন্তু সরকারী সাহায্যের পরিমান খুব স্বল্প হওয়ায় ডঃ আম্বেদকর উদারপন্থী বিত্তবান জনগনের কাছে আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানান। পার্সী ও মুসলমানদের নিকট থেকে তিনি বেশী সাহায্য, সহযোগিতা পান। ১৯১৯ সালের ১৯শে মে মধ্য প্রদেশে জলগাঁতে নির্যাতিত শ্রেণীর এক বিশাল সমাবেশে আম্বেদকর সভাপতিত্ব করেন। এই সভায় তিনি যে কোন মূল্যে এবং বর্ণহিন্দুদের যে কোন বিরুদ্ধাচারন সত্ত্বেও শিক্ষা লাভের জন্য নির্যাতিত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই সভায় একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হল-'একটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বর্ণহিন্দুরা যদি তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া বিধি নিষেধ তুলে না নেয় তাহলে তাদের ধর্মান্তর গ্রহন ছাড়া কোন উপায় থাকবে না।

একই বছরের মাঝামাঝি সময়ে ডঃ পি.জি সোলাঙ্কির প্রস্তাবানুসারে বোম্বাই সরকার নির্যাতিত ও আদিবাসীদের আর্থ-সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয়াদি নিরূপনে ডঃ সোলাঙ্কি, মিঃ ঠক্কর এবং ডঃ আম্বেদকরকে নিয়ে 'ষ্টার্টে কমিটি' গঠন করেন। উক্ত কমিটি নির্যাতিতদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনুসন্ধান পর্বে নিম্নলিখিত দুটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করে।

১) জনৈক অভিভাবকের অভিযোগ। অস্পৃশ্য বলে তার পুত্রকে

ক্লাস রুমে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না। বারান্দায় বসতে হয়। কমিটি কর্তৃক উক্ত ঘটনা সরেজমিনে তদন্ত করতে স্কুলে যাওয়া হল তখন ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক কমিটির অন্যতম সদস্য ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্য এই কথা জানতে পেরে তাঁকে স্কুলে প্রবেশ করতে দিলেন না।

২) ১৯২৯ সালের ২৩শে অক্টোবর মাসে চল্লিশ গাঁওতে নির্যাতিত জনগণ ডঃ আম্বেদকরের সম্মানে এক সম্বর্ধনার আয়োজন করলেন। চল্লিশগাঁওতে যেতে হলে টাঙ্গায় চড়ে যেতে হবে। কিন্তু টাঙ্গাওয়ালারা কেউই এই অস্পৃশ্যকে তাদের টাঙ্গায় নিয়ে টাঙ্গা অপবিত্র করতে চায় না। অগত্যা একজন টাঙ্গা ওয়ালাকে রাজী করালেও সে কিন্তু নিজে টাঙ্গা চালাবে না, টাঙ্গা চালাবে আম্বেদকরের একজন অনুগামী। দুর্ভাগ্য যে, আনাড়ী চালকের কারনে টাঙ্গা রাস্তায় উল্টে গিয়ে ডঃ আম্বেদকরের এক পায়ে মারাত্মক আঘাত পান।

কমিটি ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে নির্যাতিত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুলে পড়াশুনার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, কারিগরী শিক্ষার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, বৃত্তিরপরিমান বৃদ্ধি এবং ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আরো অধিক সংখ্যক ছাত্রাবাস নির্মানের জন্য সুপারিশ সহ অন্যান্য কিছু সুযোগ সুবিধার কথাও সুপারিশ মালায় তুলে ধরা হয়।

নির্যাতিত শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার উন্নয়নে তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিপলস্ এডুকেশন সোসাইটির মাধ্যমে ১৯৪৬ সালে বোম্বাইতে 'সিদ্ধার্থ কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। যা সমস্ত শ্রেণীর মানুষের জন্য ভারতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

একই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ১৯৫১ সালে ঐরংগবাদ কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন।

# মন্দির অভিযান

১৯২৯ সালের জানুয়ারী মাসের দিকে হিন্দুদের তীর্থস্থান এ্যম্বকে নির্যাতিতদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে চোখামেলা নামক একজন জনপ্রিয় সন্তের নামে আলাদা একটি মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করলে আম্বেদকর এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, 'নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষরা যদি হিন্দু হয় তাহলে তাদের মন্দিরে প্রবেশের অধিকার থাকবে না কেন? এবং সেই সময় মন্দিরে প্রবেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে আহবান জানান।

১৯২৯ সালের অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্যাতিত নেতা শিবরাম কাম্বলে ও রাজভোজের নেতৃত্বে কয়েকজন বর্ণবাদী নেতার সহযোগীতায় পুনায় পাবর্তী মন্দিরে প্রবেশ আন্দোলন শুরু হয়। ঐ সময় গোঁড়া হিন্দুরা ওদের উপর আক্রমন চালালে ডঃ আম্বেদকর প্রতিবাদ জানান এবং তাঁদেরকে পূর্ন সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে আশ্বাস দেন।

১৯৩০ সালে বোম্বাইতে গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার না দেওয়ার কারনে প্রবল বিবাদের সূত্রপাত ঘটে। বিবাদের সংবাদ পেয়ে ডঃ আম্বেদকর, রায় বাহাদুর বোলে সহ কয়েকজন উদার নৈতিক হিন্দুনেতা সেখানে উপস্থিত হয়ে পূজা কমিটির সাথে আলোচনা চালালেন। কিন্তু আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। ফলে পূজামন্ডপে প্রবেশের জন্য অস্পৃশ্যদের উত্তোরত্তর চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকায় পূজা কমিটি পূজা মন্ডপে অস্পৃশ্যদের প্রবেশের অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

সে বছরের উল্লেখযোগ্য দিক হল অস্পৃশ্যদের সত্যাগ্রহ পালন। নাসিকের প্রসিদ্ধ 'রাম মন্দিরে' অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রিয় রামদেবতার মন্দিরে তারাও যে কোন মূল্যে পূজা দিতে দৃঢ় সংকল্প। সত্যাগ্রহ প্রস্তুতি কমিটি মন্দিরের ট্রাস্টী বডিকে যথাসময়ে জানিয়ে দিল ১লা মার্চের মধ্যে তাদের মন্দিরে প্রবেশাধিকারে ঘোষনা না দিলে তারা হিন্দুত্বের দাবীতে জোড় করে মন্দিরে প্রবেশ করবে।

দেওরাও নায়ক, রাজভোজ, প্রধান, শিবতর্কর, প্রতিত পাবন দাস, বিজি খের প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হলেন। ২রা মার্চ আম্বেদকরের নেতৃত্বে

নির্যাতিত জনতার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং সিদ্ধান্ত হল যে, তারা ৪টি অংশে বিভক্ত হয়ে মন্দিরে প্রবেশ করবে। প্রথমে রনসাজে ব্যান্ড বাদ্য দল, দ্বিতীয়দল স্কাউট বাহিনী, তৃতীয় দল ৫শত সত্যাগ্রহী মহিলা এবং সর্বশেষে দলে আছে মন্দিরে প্রবেশাধিকারের দৃঢ় সংকল্পে উদ্বুদ্ধ ১৫ হাজার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরাট বহর। ওদিকে মন্দির কমিটি মন্দিরে প্রবেশের সমস্ত দরজা বন্ধ করে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ফোর্স মোতায়েন করেছে। বিক্ষোভকারীরাও অনঢ়। তারা পরের দিন থেকে মন্দিরের সব প্রবেশদ্বারে অবস্থান ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেয়। ৩রা মার্চ থেকে শুরু হল অবরোধ সত্যাগ্রহ। এতে উচ্চ পদস্ত দু'জন বিচারককে সেখানে মোতায়েন করা হল এবং পুলিশ সুপার মন্দিরের সামনে তাবু ফেলে সেখানেই দপ্তর নিয়ে এলেন।

৯ই এপ্রিল শ্রীরামের রথযাত্রার দিন। উপরোক্ত অচলাবস্তা নিরসনকল্পে উভয়পক্ষ একটি সমযোতায় আসলো। উভয় শ্রেণীর একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক মানুষ রথ টানায় অংশগ্রহণ করবেন। রথটানার দিন দেখা গেল নির্যাতিত শ্রেণীর রথটানার জন্য নির্বাচিত লোকজন যখন মন্দির দ্বারে উপস্থিত হলেন তখন বর্ণহিন্দুদের দ্বারা নিয়োজিত একদল ভাড়াটিয়া গুন্ডা কর্তৃক তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। এই সুযোগে গোঁড়া হিন্দুরা রথ টেনে দ্রুত গতিতে একটি সরু গলিতে ঢুকে পড়ে। তৎক্ষনাৎ গলির মুখে পুলিশ কর্ডন করে দেয়। পুলিশ কর্ডন করেও অস্পৃশ্যদের রথটানা থেকে বিরত রাখতে পারেনি। এই হট্টগোলের সময় ভাড়াটিয়া গুন্ডারা সত্যাগ্রহী নেতৃবৃন্দের উপর হামলা চালালে ডঃ আম্বেদকরসহ অনেকেই আহত হন।

১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে নির্যাতিত শ্রেণীর আরেক বিশিষ্ট নেতা কেল্লাপন কর্তৃক গুরু ভায়ুয়ের মন্দিরে প্রবেশের আন্দোলন এবং পরে আমরন অনশন শুরু করেন। ডঃ আম্বেদকর তার কাছে সংবাদ পাঠন, গুরুভায়ুরের মন্দির দার উন্মুক্ত করার চেয়ে তার জীবনের মূল্য অনেক বেশী। গান্ধীজী ও কেল্লাপনকে তিন মাসের জন্য অনশন স্থগিত রাখার জন্য অনুরোধ জানান। তাছাড়া গান্ধিজী মন্দির প্রবেশের আন্দোলনকে বানচাল করার জন্য বিভিন্ন কুট কৌশল প্রয়োগ করতে লাগলেন।

ডঃ আম্বেদকর গান্ধীর টালবাহানা বুঝতে পেরে তাঁর আন্দোলনের কৌশল পরিবর্তন করলেন। কারন ইতিমধ্যে গান্ধীও হরিজনদের মন্দির প্রবেশের আন্দোলনের নামে রাজনীতি শুরু করে দিলেন।

ডঃ আম্বেদকর পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন একমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাই তাদের পার্থিব দুঃখ দুর্দশার হাত থেকে রক্ষা করতে পারে। ধর্মের নামে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা ধর্মান্ধদের বিভ্রান্ত করে, শোষণ ও প্রতারণা করে। বর্তমান জীবনের দুঃখ দুর্দশা পূর্বজন্মের কর্মফল বলেও তারা কুটকৌশলে চালিয়ে দেয়। তিনি বলেন -উন্নত জীবনের জন্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভিত্ রচনার মাধ্যমে সামাজিক অধিকার করায়ত্ব করা সম্ভব। তাছাড়া তিনি তাদের মধ্যে আত্ম সম্মানবোধ জাগ্রত করতে ও স্বাবলম্বী হতে অনুরোধ করেন।

ইতিমধ্যে কসবা ( মানে জেলা)- তে অনুষ্ঠিত এক সভায় তিনি বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন ঃ "We want equality in Hindu religion, the chaturbarnya must be rooted out. The principle that privatages for the higher classes and poverty for the lower classes must be end now."

তিনি অনুগামীদের এটাও স্মরণ করে দেন যে, তারা (অস্পৃশ্যরা) যেন কখনও তার উপর দেবত্ব আরোপ না করেন। হিন্দুদের এত অধঃপতনের মূল কারণ হচ্ছে মানুষের উপর দেবত্ব আরোপ করা বা কাউকে ত্রাণকর্তা হিসেবে প্রতিপন্ন করা। অর্থাৎ কোন মানুষের মধ্যে অত্যুজ্জল সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে দেখলে তাকে সাধারণ মানুষ থেকে আলাদা ভেবে অবতারে পরিনত করাই হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের প্রচলিত রেওয়াজ।

১৯৩৩ সালে অনুষ্ঠিত এক বিশাল জনসভায় শুদ্র জাতির উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, ('যারা জেগে ঘুমায় তাদের জাগানো মুশকিল ধর্মের নামে পূর্বজন্মের পাপ পুন্য, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতির নামে যাদেরকে হাজার হাজার বছর ধরে নেশাতুর করে রাখা হয়েছে তাদেরকে জাগানো কঠিন।) কিন্তু অসম্ভবকে সম্ভব করার এক অদম্য স্পৃহা নিয়েই তিনি অস্পৃশ্যদের মুক্তির জন্য লড়ে গেছেন। তাদেরকে জাগানোর জন্য তিনি আজীবন লড়ে গেছেন তিনি বলেছেন- "You must abolish your slavery yourselves. Do not depend for its abolition upon God or superman. Your salvation lies in political observance of fasts. Devotion to scriptures would not free you from bondage, wandt and poverty your fore-fathers have been doing it

for generations, but there has heen no respite not even sight difference in your miserable life in any way."

"ভগবানের প্রতি ভক্তি, কোন মহাত্মার পেছনে ছোটা, তীর্থ গমন, অনশন বা উপবাসে মুক্তি মিলবেনা, মুক্তি মিলবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।"

## লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকের তাৎপর্য

ভরতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় লন্ডনে অনুষ্ঠিত প্রথম ও দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। গোলটেবিল বৈঠক তিনটি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথম বৈঠকের অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর। এই বৈঠকের সদস্য সংখ্যা ছিল উনানব্বই জন। কংগ্রেসের কোন সদস্য এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করেননি। এই বৈঠকে উল্লেখযোগ্য যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন ভারতের উদারনৈতিক নেতাদের মধ্যে তেজবাহাদুর সপ্রু, জয়াকার, চিমনলাল শীতলবাদ, শ্রী নিবাস শাস্ত্রী ও চিন্তামন, মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন- মহম্মদ আলী জিন্না, এ,কে ফজলুল হক, মহম্মদ সফী ও আখা খাঁ; শিখ নেতা উজ্জল সিং ভারতীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে বরোদা, ভূপাল, আলোয়ার, বিকানীর কাশ্মীর প্রভৃতি রাজ্যের অধিপতিগণ ও হিন্দু সভার ডঃ মুঞ্জে এবং অনুন্নত জাতির প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন ডঃ আম্বেদকর ও রায় বাহাদুর শ্রীনিবাসন। ১৯৩০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ভারতের বড় লাট কর্তৃক এই বৈঠকে যোগদানের জন্য নিমন্ত্রন পত্র পাওয়ায় ডঃ আম্বেদকর আনন্দিত হলেন। কারন এই শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে ইতিপূর্বে কেউই অংশ গ্রহণের সুযোগ পাননি।

ডঃ আম্বেদকর ৪ঠা অক্টোবর 'ভাইসরয় অব ইন্ডিয়া' জাহাজে চড়ে বোম্বাই বন্দর ত্যাগ করার পূর্বে তাঁর অসংখ্য গুনগ্রাহী কর্তৃক সম্বর্ধিত হয়েছিলেন এবং তাদের কাছ থেকে একটি টাকার থলি ও উপহার হিসেবে পেয়েছিলেন।

নির্ধারিত ১২ ই নভেম্বর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে ১৯শে জানুয়ারী পর্যন্ত চলে। বৈঠক উদ্বোধন করেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ এবং এই বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড। হিন্দু, মুসলমান সমস্ত নেতারাই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবকে সমর্থন করেন।

বৈঠকে সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দ তাদের স্ব-স্ব বক্তব্য উপস্থাপন করেন। কিন্তু যার বক্তৃতা শুনে বৈঠকে উপস্থিত সবাই বিস্মিত হয়েছিলেন তিনি হলেন ভারতের অস্পৃশ্য শ্রেণীর তরুন সুশিক্ষিত নেতা ডঃ আম্বেদকর। Indian Daily Mial পত্রিকার মতে- 'The finest bits of oratory during the whole conference.'

তিনি ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের কাছে প্রশ্ন রাখেন, ভারতে তার শ্রেণীর যে বিশাল জনগোষ্ঠী ক্রীতদাস অপেক্ষাও যে ঘৃণ্যতম অবস্থার মধ্যে দিনাতিপাত করছে তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য সরকার কতটুকু উদ্যোগ নিয়েছে? অস্পৃশ্যতার যে কালিমা তাদের উপর লেপন করা হয়েছে তা থেকে ব্রিটিশ সরকারও কি এক বিন্দুও মুক্তি দিতে পেরেছে? কারন পাছে স্বার্থান্বেষীগোষ্ঠীর অপ্রিয়ভাজন হতে হবে। ইংরেজদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী ব্রিটিশ সরকার বরং কুলীনকে আরো বেশী কুলীন এবং অকুলীনকে আরো অকুলীন করার পন্থা বেছে নিয়েছিল।

তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ভারতবাসী ও অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক অধিকারের ঘোষণা পত্র রচনা করেন। যেমন ঃ

১) ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ব শাসনের দাবী।

২) সর্বস্তরের জনগণের গ্রহণযোগ্য সংবিধান

৩) অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে অনুন্নত শ্রেণীর জনগনের সমনাধিকার অস্পৃশ্যতার বিলোপ সাধন এবং অনুন্নত জনগনের উপর থেকে যাবতীয় বিধি নিষেধ তুলে দিয়ে সর্বপ্রকার বৈষম্যমূলক কর্মকান্ডের অবসানকল্পে আইন প্রনয়নের দাবী জ্ঞাপন ছিল 'মৌলিক অধিকারের ঘোষণা' রচনার মূল উদ্দেশ্যে।

প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে সমস্ত সদস্য ঐকমত্যে আসতে না পারলেও ভারতের পশ্চাৎপদ জনগণের কাছে এই বৈঠকের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের প্রতি অমানবিক আচরন ও অন্যান্য সমস্যাবলীর কথা

ব্রিটিশ সরকার ও বিশ্ববাসীর দৃষ্টি গোচরীভূত হল। এ কৃতিত্বের একমাত্র দাবীদার বিশ্ববিশ্রুত পন্ডিত ও বাগ্মী ডঃ আম্বেদকর।

লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর। এই বৈঠকে উপস্থিত সদস্য সংখ্যা ১২৫ জন। এদের মধ্যে মুসলিম লীগের সভাপতি মুহম্মদ ইকবাল, ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি জি,ডি বিড়লা, পন্ডিত মদন মোহন মালব্য, খৃষ্টান প্রতিনিধি এস,কে,দত্ত, সরোজিনী নাইডু ও স্যার আলী। এই বৈঠকের আকর্ষনীয় দুই সদস্য হলেন কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি করম চাঁদ গান্ধী ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জনগণের প্রতিনিধি ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর।

এই বৈঠকের প্রধান দুইটি আলোচ্য বিষয় ছিল 'ফেডারেল স্ট্রাকচার' ও 'মাইনরটিজ সাব কমিটির' কাজ সম্পর্কে ছূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ। ডঃ আম্বেদকর উভয় কমিটির সদস্য ছিলেন।

গান্ধীজী বল্লেন, 'একমাত্র কংগ্রেসই ভারতের হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান। অতএব কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তিনি ভারতের প্রকৃত প্রতিনিধি।

এই বৈঠকেও ডঃ আম্বেদকরের বক্তৃতা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। তাঁর বক্তৃতার একাংশে তিনি বলেছেন, ভারতীয় রাজন্য বর্গ যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করতে চান, তাহলে রাজ্যের প্রতিনিধিদেরকে জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে হবে। রাজা কর্তৃক মনোনীত হলে চলবে না, কারণ মনোনীত সদস্যযুক্ত ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রকৃত দায়িত্বশীল সরকার বলে গণ্য হতে পারবেনা। অপর দিকে রাজন্যবর্গ চান তাদের কর্তৃক প্রতিনিধি মনোনীত হোক। তাদের এই দাবীকে মহাত্মা গান্ধীও প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

'মাইনরিটিজ সাব কমিটি'র অধিবেশন শুরু হওয়ার পূর্বে মুসলিম নেতাদের সাথে গান্ধিজীর গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে মুসলমানদের অধিকাংশ দাবী মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় এই বলে যে, তারা যেন ভারতের অস্পৃশ্য শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে উত্থাপিত ডঃ আম্বেদকরের প্রস্তাবকে সমর্থন না করেন। যা হোক বহু গোলমালে 'মাইনরিটিজ সাব-কমিটি'র অধিবেশন অনির্দিষ্ট কালের জন্য মূলতবী রাখা হয়।

গান্ধিজী নিজেকে অনুন্নত শ্রেণীর প্রকৃত প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য ডঃ আম্বেদকরকে যেন তেন প্রকারে কোনঠাসা করতে সচেষ্ট ছিলেন। গান্ধিজীর এই প্রক্রিয়া আম্বেদকরকে অধিকতর ক্রোধান্বিত করে তুলল।

এদিকে ভারতে ডঃ আম্বেদকরের দাবীর সপক্ষে তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামী ও সমর্থকদের দ্বারা এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এতে তাঁর উত্থাপিত প্রস্তাবের জোর সমর্থন সহ পৃথক নির্বাচনের দাবী জানিয়ে শত শত কপি টেলিগ্রাম লন্ডনে প্রেরিত হল। কলিকাতার মুকুন্দ বিহারী মল্লিকের নেতৃত্বেও উক্ত বিষয়ে একটি টেলিগ্রাম প্রেরিত হয়। অনুন্নত শ্রেণীর প্রকৃত নেতা কে এতেই প্রমাণিত হয়।

ডঃ আম্বেদকর ও শ্রী নিবাসন কর্তৃক একটি অতিরিক্ত স্মারক লিপিও পেশ করা হয়। এই স্মারক লিপিতে যে সমস্ত দাবী তাঁরা উত্থাপন করেছেন তার কয়েকটি এখানে লিপিবদ্ধ হলঃ-

১) প্রদেশ এবং কেন্দ্রীয় আইন সভায় তাদের লোকসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি থাকবে।

২) তাদের জন্য পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা।

৩) অনুন্নত শ্রেণীর পরিবর্তে তাদেরকে 'অ-বর্ণ হিন্দু' অথবা প্রোটেস্ট্যান্ট 'হিন্দু' অথবা 'নন কন্‌ফার্মিষ্ট হিন্দু' নামে অভিহিত করা।

# ঐতিহাসিক পুনা চুক্তি ও ফলাফল

১৯৩২ সালের জানুয়ারীতে"ফ্রান্সাইজ কমিটির" আহবানে কমিটির সদস্যদের সাথে আম্বেদকর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ পরিভ্রমনকালে সর্বত্রই তার উদ্যোগে নির্যাতিত শ্রেনীর লোকেরা কমিটির কাছে তাদের পৃথক নির্বাচনের দাবী জানিয়েছেন।

তখন কেন্দ্রীয় আইন সভায় নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি ছিলেন এম,সি, রাজা।তিনি আম্বেদকরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেললেন। তিনি প্রথমে ডঃ আম্বেদকরের পৃথক নির্বাচনের সক্রিয় সমর্থক হলেও পরবর্তীতে ডঃ মুঞ্জের সাথে একত্রে সংরক্ষিত আসনের ভিত্তিতে যুক্ত নির্বাচনের দাবী জানিয়ে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্মারক লিপি প্রেরন করেন।

ডঃ আম্বেদকর পূর্বে সংরক্ষিত আসনে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন ও সাইমন কমিশনে উক্ত দাবী করেছিলেন। কিন্তু আম্বেদকরের উক্ত দাবী গান্ধিজী মেনে নিতে অপরাগতা প্রকাশ করায় নির্যাতিত জনসাধারণ বিক্ষুদ্ধ হয়ে ওঠে এবং ডঃ আম্বেদকরও পৃথক নির্বাচনের জোরালো দাবী তোলেন।এই দাবীর সমর্থনে সারা ভারতে প্রচন্ড উত্তেজনা দেখা দেয়। নির্যাতিত শ্রেণীর অনেক সংগঠন এই দাবীর সমর্থনে এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে মাদ্রাজ প্রোভিন্সিয়াল ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস ফেডারেশন,কেরেলা ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস আর্মি সার্ভিসেস ইনস্টিটিউট, দ্রাবিড় মালয়ালাম সভা, যুক্তপ্রদেশ আদি হিন্দু এসোসিয়েশন, দিল্লী ডিপ্রেসড্ ক্লাস সোসাইটি ছাড়াও অনেক সংগঠন।

১৯৩২ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতার এ্যালবার্ট হলে ডাঃ কালি চরন মন্ডলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত "বেঙ্গল নমঃশুদ্র এসোসিয়েশন"এর বার্ষিক সম্মেলনে আম্বেদকরের দাবীর বিরুদ্ধাচারনকারী সংগঠন ও পত্র

পত্রিকার বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯৩২সালের ১লা মে 'ফ্রান্সাইজ কমিটির' অধিবেশন শেষ হয়। এই কমিটি কর্তৃক নির্যাতিত শ্রেণীকে একটি সুস্পষ্ট ভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে অর্থাৎ হিন্দু সমাজে যে সমস্ত শ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য বলে গন্য করা হয় তারাই 'নির্যাতিত শ্রেণী' নামে অভিহিত হবে।

এরপর ৭ই মে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় নির্যাতিত শ্রেণীর মহা সম্মেলনে ১৫/২০ হাজার লোকের সমাবেশ ঘটে। এতে ডঃ আম্বেদকরের দাবীর সমর্থনে প্রায় দুইশত অভিনন্দন বার্তাও এসে পৌঁছে ছিল।

হিন্দু সমাজের নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের উদাত্ত আহবান জানিয়ে বৌদ্ধ মহাসভার সাধারণ সম্পাদকও এক অভিনন্দন বাণী পাঠান।

সভাপতির ভাষণ দানকালে রাজা-মুঞ্জে ফ্যাক্টের সমর্থক পি, এন রাজভোজ কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করার জন্য উঠে দাঁড়ালে তাঁকে সভাপতির ভাষণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য বলা হয়। এদিকে সভার শৃংখলাভঙ্গের কারণে জনতার প্রচন্ড আক্রোশ বেড়ে গেলে রাজভোজ সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এই সম্মেলনে নির্যাতিত শ্রেণীর স্বার্থ সম্বলিত ১২টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এতে রাজা-মুঞ্জে ফ্যাক্টকে নির্যাতিত শ্রেণীর স্বার্থ বিরোধী বলে ঘোষনা করা হয় এবং পৃথক নির্বাচনের দাবী সমর্থিত হয়।

এম,সি রাজার ডিগবাজীর কারণে আম্বেদকর বিচলিত হন এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সাথে ব্যাক্তিগত ভাবে যোগাযোগ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলে শীঘ্রই তিনি লন্ডনের পথে যাত্রা করলেন। তিনি ১৯৩২ সালের ৭ই জুন লন্ডনে পৌঁছে দাবী সম্বলিত ২২পৃষ্ঠার এক স্বারকলিপি ব্রিটিশ কেবিনেট পেশ করেন এবং উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করে নির্যাতিত শ্রেণীর অনেক বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের অবহিত করলেন।

ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক ১৯৩২ সালের আগষ্ট মাসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার রায় ঘোষিত হয়। এই ঘোষনা অনুযায়ী পশ্চাৎপদ শ্রেণীর জন্য প্রাদেশিক আইন সভায় পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা এবং দ্বৈত ভোটাধিকারের ব্যবস্থাও স্বীকৃত হয়। এই দ্বৈত ভোট পদ্ধতি হল- একটি ভোট নিজেদের প্রার্থীকে এবং অন্যটি সাধারন প্রার্থীকে প্রয়োগ করতে পারবে। তাছাড়া ভারতের অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্যও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। ফলে হিন্দুরা পার্লামেন্টে সংখ্যালঘিষ্ট হয়ে পড়বে। হিন্দু স্বার্থ সংশ্লিষ্ট পত্র পত্রিকাগুলো সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক খবর ছাপাতে থাকে। এতে সবচেয়ে বেশী আঘাত প্রাপ্ত হলেন উচ্চ বর্ণ হিন্দুদের স্বার্থরক্ষাকারী মহাত্মা গান্ধী। তিনি তখন পুনার যারবেদা জেলে ছিলেন। তিনি মনে করলেন যে এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবেসিত হতে চলেছে। নির্যাতিত শ্রেণীর বহু প্রত্যাশিত ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থাকে মেনে নিতে না পেরে আমরণ অনশনের মধ্য দিয়ে গান্ধিজী শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করলেন।

গান্ধিজীর আমরণ অনশনের সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নেতা কর্মীদের মধ্যে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। গান্ধিজীর জীবন রক্ষার জন্য ডঃ আম্বেদকরের ঐকান্তিক সহযোগিতা কামনা করে বোম্বাইতে একটি সম্মেলন করার জন্য পন্ডিত মালব্য প্রস্তাব রাখলেন।

অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস যে, যেই কংগ্রেস নেতারা এতদিন যাবত আম্বেদকরের নেতৃত্বকে বিন্দুমাত্র স্বীকার করতে চাননি তারাই আজ ডঃ আম্বেদকরের সিদ্ধান্ত জানার জন্য তাঁর চারপাশে ভিড় জমিয়েছেন। অসংখ্য টেলিগ্রাম ও পত্র মারফতে গান্ধিজীর জীবন রক্ষা, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দাবী ত্যাগের অনুরোধ, কেউ বা ডঃ আম্বেদকরের জীবন নাশের হুমকী আবার কেউবা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সিদ্ধান্তে অটল থাকার অনুরোধ জানিয়েছেন।

ডঃ আম্বেদকর তাঁর সিদ্ধান্তে অবিচল আছেন। নির্যাতিত জনগণের অধিকারকে ক্ষুন্ন করতে তিনি নারাজ। যে গান্ধিজী লন্ডনে অনুষ্ঠিত গোল টেবিল বৈঠকে নির্যাতিত শ্রেণীর জনগণের সমস্যাকে মামুলী ব্যাপার বলে

গণ্য করেছিলেন অথচ আজ তিনি সেই মামুলী সমস্যার জন্য কেন আমরণ অনশন পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

ডঃ আম্বেদকর প্রশ্ন তোলেন- গান্ধিজী তো ইংরেজদের দেশ ছাড়তে, মুসলমান বা অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে বা সমাজ থেকে চিরতরে অস্পৃশ্যতার মূল্যোৎপাটন করতে কোনদিন আমরণ অনশনে যাননি। আসলেই তিনি শক্তমাটিতে পদাঘাত করার মত মুর্খ নন। অন্যান্য সংখ্যালঘুদের পৃথক নির্বাচনে যদি ভারতের জাতীয়তা নষ্ট না হয় তাহলে অস্পৃশ্যদের পৃথক নির্বাচনে ভারতের জাতীয়তা নষ্ট হবে কেন?

পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গান্ধিজীর আমরণ অনশন শুরু হয়ে গেল। তাঁর অনশনের প্রেক্ষিতে ১৯৩২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের 'ইন্ডিয়ান মার্চেন্টস চেম্বার হলে' পন্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে বর্ণবাদী হিন্দুদের একটি সম্মেলন আহুত হয় । এই সম্মেলনে ডঃ আম্বেদকরও আমন্ত্রিত হয়ে সভায় উপস্থিত ছিলেন। এ সভায় আন্যন্য যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ মুঞ্জে, ডঃ সোলাংকি , চিমল লাল শীতলবাদ , ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, ডঃ দেশমুখ, ডঃ সাভারকর, মানু সুবেদার, কমলা নেহেরু , তেজ বাহাদুর সপ্রু, চৈত রাম, অ্যানি বেসান্ত, ঠক্কর, কে নট রাজন ও পি,ও গিদওয়ানী প্রমূখ উল্লেখযোগ্য ।

সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রথমে ডঃ আম্বেদকর তাঁর নাতিদীর্ঘ বক্তৃতায় যা বল্লেন- কিছু সার সংক্ষেপ এখানে তুলে ধরা হল, " এটা দুঃখের বিষয় যে , গান্দিজী নির্যাতিত শ্রেনীর জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে আমরণ অনশন শুরু করেছেন। সকলে যে তাঁর মুল্যবান জীবন রক্ষার জন্য ব্যাকুল হবেন এটাই স্বাভাবিক । আপনারা হয়তো আমাকে নিকটতম ল্যাম্পপোষ্টে ঝুলিয়ে গুলি করে মারতে পারেন ; কিন্তু আমি যে পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্যভার গ্রহণ করেছি তা থেকে আমি বিচ্যুত হতে পারব না । গান্ধিজী কোন বিকল্প প্রস্তাব না রাখায় আমি এই সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিনা। আপনারা বরং গান্ধিজীকে এক সপ্তাহের জন্য অনশন বন্ধ রাখতে অনুরোধ জানান এবং এই সময়ের মধ্যে কোন না কোন একটা সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।"

দ্বিতীয় দিনে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু কর্তৃক উদ্ভাবিত ইলেকশান সম্পর্কিত একটি ফর্মূলা ডঃ আম্বেদকরের দৃষ্টিগোচর করলে তিনি তাঁর অন্যতম সহযোগী পি, জি , কানেকারের সাথে আলাপ করতঃ এই প্রস্তাবে রাজী আছেন , তবে বাঁটোয়ারার নির্ধারিত আসনের চেয়ে আরো বেশী আসন দিতে হবে বলে তিনি জানিয়েছেন । কিন্তু গান্ধিজী এই ফর্মূলা গ্রহন করলেন না।

২২শে সেপ্টেম্বর গান্ধিজীর অনুগামীদের সাথে ডঃ আম্বোদকরের আলোচনার পর আম্বেদকর জানালেন যে, পৃথক নির্বাচনের বিকল্পে পরিস্কার চিত্র না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এ বিষয়ে কোন অভিমত দিতে পারছেননা। ঐ দিন সন্ধ্যায় ডঃ আম্বেদকরকে নিয়ে কতিপয় মধ্যস্ততাকারী যারবেদা জেলে গান্ধিজীর সাথে আলোচনা করতে যান ।

২৩শে সেপ্টেম্বর আলোচনাকালে ডঃ আম্বেদকর রাজ্যসমুহে ১৯৭ টি আসন দাবী করলেন । কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ১২৬ টি পর্যন্ত ছাড় দিতে রাজী , সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ নিয়ে অচলাবস্থা দেখা দিল। প্রাইমারী ইলেকশানের মেয়াদ ১০ বৎসর পরে শেষ হবে; কিন্তু ২৫ বৎসর পরে নির্যাযিত শ্রেণীর জনগণের ভোটের দ্বারা সংরক্ষিত আসনের মেয়াদ ঠিক করা হবে । বর্ণহিন্দুরা ডঃ আম্বেদকরের এই প্রস্তাব মেনে নিলেন না। এ প্রসঙ্গে আম্বেদকর বললেন ২৫ বৎসরেও বর্ণহিন্দুরা অস্পশ্যদের প্রতি তাদের আবহমানকালের ঘৃণা ও অবজ্ঞা পরিহার করবে না বলে তাঁর বিশ্বাস । তবে গণভোটের খাঁড়া মাথার উপর ঝুললে তাদের শুভবুদ্ধির উদয় হতে পারে ভেবে তিনি এ বিষয়ে এতটা গুরুত্বারোপ করছেন ।

, এ দিকে গান্ধিজীর শারীরিক অবস্থা ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছে । বিষয়টি ডঃ আম্বেদকরকেও চিন্তিত করে তুলল। তিনিও উপায়ান্তর না দেখে ২৪শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত বৈঠকে একটা আপোষ রফায় চলে আসার সিদ্ধান্ত নিলেন । সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় দ্বৈত ভোট পদ্ধতিতে বন্টিত ৭৮টি আসনের পরিবর্তে নির্যাতিত শ্রেণীর জন্য এখন ১৪৮টি আসন বৃদ্ধি করা হয়েছে বটে, কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল তাদের কাছ থেকে দ্বিতীয় ভোটাধিকার হরণ। দ্বিতীয় ভোটাধিকারে নিজেদের প্রতিনিধি

নিজেরাই নির্বাচিত করার সুযোগ ছিল। এই দ্বিতীয় ভোটের মাধ্যমে অস্পৃশ্যরা সহজেই সাধারণ নির্বাচনকে প্রভাবান্বিত করতে পারতো । কিন্তু দ্বিতীয় ভোটাধিকার হরণের ফলে তাদের রাজনৈতিক অধিকার চরমভাবে খর্ব হয়েছে। এই চুক্তি ভারতের ইতিহাসে "কুখ্যাত পুনা চুক্তি " নামে চিহ্নিত হয়ে আছে । এ প্রসঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের নিম্মোক্ত বক্তব্য হল ঃ-

'The second vote given by the Communal Award was a priceless privilege. Its value as a political weapon was beyond reckoning. The voting strength of the untouchables in each constituency is one to ten. With this voting strength free to be used in the election of caste Hindu candidates, the untouchables would have been in a position to determine, if not dictate, the issue of the General Election. No caste Hindu candidate could have dared to neglect the untouchable in his constituency or be hostile to their interest if he was made dependent upon the votes of the untouchables. Today the untouchables have a few more seats than were given to them by the Communal Award. But this is all that they have. Every other member is indifferent, if not hostile. If the Communal Award with its system of double voting had remained the untouchables would have had a few seats less but every other member would have been a member of the untouchables ..'

গান্ধিজী যে ভুমিকায় অবতীর্ণ হলেন, তা হল- 'কার্যোদ্ধারের জন্য পরম শত্রুর কাছেও পরম মিত্রের অভিনয় করা'। পুনাচুক্তিতে ৭৮টি আসনের পরিবর্তে ১৪৮টি আসন দিতে গান্দ্বিজী কার্পণ্য করেননি । এটা হচ্ছে গান্দ্বিজীর 'ডান হস্ত দান করে বাম হস্ত' কেড়ে নেবার নীতি । গান্ধীর অতি বাড়াবাড়ি জওহরলাল নেহেরুকেও বিব্রতকর অবস্থার ফেল্‌ল। তাঁর নিম্মোক্ত বক্তব্য থেকে এ কথা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ।

" I felt annoyed with him ( Gandhi ) for choosing a side issue for his final sacrifice. What would be the result of our freedom movement? Would not the larger issues fade into the background for the time being at least? ...

I felt angry with him religious and sentimental approach to a political question, and his frequent references to God in connection with it. He even seemed to suggest that God had indicated the very date of the fast. What a terrible example to set.

অর্থাৎ, "একটি পার্শ্ববর্তী বিষয়কে কেন্দ্র করে গান্ধীর সর্বশেষ আত্মত্যাগ করাতে আমি বিরক্তবোধ করছিলাম। একটি রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মীয় ও আবেগ প্রবন দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহন এবং বার বার ভগবানের নাম উল্লেখ করায় তাঁর উপর আমার রাগ হয়।"

# পত্নী বিয়োগ ও দ্বিতীয় বিবাহ

১৯৩৪ সালের ১লা জুন বোম্বাই সরকারী আইন কলেজে পার্ট টাইম অধ্যাপনার কাজ নেওয়ার পর থেকে আম্বেদকরের অর্থ উপার্জন ভালই হচ্ছিল ।, ছোটকাল থেকে তার একটি সুন্দর বাড়ীর স্বপ্ন ছিল যেখানে থাকবে হাজার হাজার পুস্তকে পরিপূর্ণ একটি বৃহদায়তনের লাইব্রেরী । এখন অবাল্য স্বপ্ন পুরণের মতো অর্থও হাতে আসতে লাগ্‌ল । দাদারের হিন্দু কলোনীতে নিজের মত করে একটি সুন্দর বাড়ী তৈরী করলেন যার উপরতলায় হলো লাইব্রেরী । বড়িটির নাম রাখা হলো " রাজগৃহ "। প্রাচীনকালের-"রাজগৃহ " নামটির সাথে বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের পরিচিতি অত্যন্ত নিবিড় । রাজগৃহের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট একাধিক । এদিকে পত্নী রমাবাঈয়ের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল । উদ্বেগ , উৎকণ্ঠা ও দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত স্বামীর কল্যাণে কঠোর ব্রত এবং উপবাসাদি পালন করে অনেক আগেই এই মহিলার শরীর জীর্ণশীর্ণ ও রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েছে । রাজগৃহের নতুন পরিবেশেও তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না।

জীবনের অধিকাংশ সময় পড়াশুনা, সামাজিক, সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মকান্ডে ব্যস্ত থাকার প্রয়োজনে পরিবারের প্রতি আম্বেদকরের তেমন নজর দেওয়ারও সুযোগ হয়নি । তবুও এই পতিপরায়ণা পত্নীর চিকিৎসার্থে তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ডাঃ বায়ু পরিবর্তনের জন্য রমাবাঈকে বাইরে নেওয়ার পরামর্শ দিলে তিনি কালবিলম্ব না করে পত্নীকে ধারওয়ার নিয়ে গেলেন ।

স্ত্রীর ক্রমাগত স্বাস্থ্যহানী ডঃ আম্বেদকরকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিয়েছে । কারন তাঁর জীবনের সাফল্যের নেপথ্যে ছিলেন ধর্মপরায়ণা, প্রতিপরায়ণা ও সাংসারিক কাজে কর্মনিষ্ঠ এই মহিলা ।

১৯৩৫ সালের ২৭শে মে আম্বেদকরের পরিবারে নেমে এসেছে

বিষাদের কালোছায়া । স্বামীর কল্যাণ ও হিতার্থে ছায়ার মত অনুসরণকারী এই মহিলার জীবনাবসান হলে তেজস্বী , জ্ঞানী ও চির সংগ্রামী নেতা ডঃ আম্বেদকর শোকে বিহবল হয়ে পড়েন ।

রমাবাঈয়ের সৎকারে সে দিন শ্মশানে উপস্থিত হয়েছিলেন আম্বেদকরের শুভাকাংখী নিম্নবর্ণের দশ বার হাজার নর নারী ।

রমাবাঈয়ের মৃত্যুর পর দীর্ঘ বছর ধরে তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় ছিলেন । যতই দিন যাচ্ছে ততই তিনি বিভিন্ন কর্মকান্ডে সচেষ্ট হতে লাগলেন । এই ভাবে শারীরিক ও মানসিক চাপ বেড়ে যাওয়ায় তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন । বোম্বাইয়ের একটি হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসা করাতেন । সেই হাসাপাতালের ডাঃ শ্রীমতি সারদা কবির যিনি ডঃ আম্বেদকরের চিকিৎসা ও সেবা সুশ্রুষার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিয়েছিলেন । এ ভাবে দীর্ঘ চিকিৎসা জীবনে রোগী ও চিকিৎসকের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্ক অল্পদিনের মধ্যে হৃদয় গঠিত সম্পর্কে মোড় নেয়।

রমাবাঈয়ের মৃত্যুর পর তিনি দ্বিতীয় কোন রমনীর দারপরিগ্রহ করবেন না বলে সংকল্পবদ্ধ হয়ে নিঃসঙ্গ অবস্থায় দীর্ঘ বছর অতিবাহিত করলেও ক্রমবর্ধমান শারীরিক ও মানসিক চাপ এবং অনিয়মিত খাবার, বিশ্রামের অভাব ও নৈকট্যজনের সঙ্গের অভাবে তাঁর দৈহিক অবস্থা যখন দ্রুত ভেঙ্গে পড়ছিল ঠিক এই মুহুর্তে ডাঃ সারদার সাহচর্য্যে সেই অভাব অনেকটা লাঘব হতে চলেছিল তখন তাঁর ব্যক্তি জীবনে এমনি একজন দরদী ও সহানুভুতিশীল সঙ্গীর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য্য হয়ে পড়েছিল ।

তিনি তাঁর প্রিয়তম অনুগামী চিত্র ও গাইকোয়াড়কে ডাঃ শ্রীমতি সারদা কবিরের সাথে বিয়ের খবর ব্যক্তিগত পত্রে জানালেন । আম্বেদকরের এই বিয়ের সিদ্ধান্তে ঘরে বাইরে সর্বত্র অনেক বির্তকের ঝড় বয়ে গেল ।

অবশেষে ১৯৪৮ সালের ১৫ ই এপ্রিল ৫৭ বছর বয়সে নয়াদিল্লির ১নং হার্ডিঞ্জ এভিনিউস্থ স্বীয় বাসভবনে ডঃ আম্বেদকর ও ডাঃ শ্রীমতি সারদা কবির রেজিষ্ট্রিকৃত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলেন। উল্লেখ্য যে, ডাঃ সারদা কবির নিঃসন্তান এবং বর্তমানেও তিনি জীবিত আছেন ।

# ইয়োলা সম্মেলন

১৯৩৫ সালের ১৩ ই অক্টোবর ইয়োলা সম্মেলনের দিন ধার্য হয় । আসন্ন ইয়োলা সম্মেলনে ডঃ আম্বেদকর ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেবেন বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে ।

নিদিষ্ট দিবসে অনুষ্ঠান যথারীতি শুরু হল । অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি স্বাগত ভাষনে বল্লেন, " ভারতে হিন্দু ধর্মের নামে চলছে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, সমস্ত প্রকার সুযোগ সুবিধার পাকাপাকি ব্যবস্থা করাই ব্রাহ্মণ্যবাদের মূল কথা , ভাগ কর ও শাসন কর " এই নীতি ব্রাহ্মণ্যবাদের মৌলিক কৌশল । এই নীতিকে ধর্মের সংগে যুক্ত করে এবং তা চিরস্থায়ী করার জন্য বর্ণাশ্রমের প্রতিষ্ঠাপূর্বক ব্রাহ্মণদের বর্ণশ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করা হয় । তাদের আর একটি কৌশল দেব-দেবীর সৃষ্টি , দেব-দেবীর উদ্দেশ্যে ভক্তদের দানীয় বস্তু দেব-দেবীর পক্ষে গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক আত্মসাৎ করণ ।"

এই অনুষ্ঠানে ডঃ আম্বেদকর তাঁর দেড় ঘন্টার ভাষণে বল্লেন, " নির্যাতিত শ্রেণীর মানুষদের হিন্দু হয়েও যদি হিন্দুর সম অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকতে হয় , বিগত ১৫ বছরে ধরে বিভিন্ন আর্থ - সামাজিক , শিক্ষা, রাজনৈতিক শোষণ , বঞ্চনার বিরুদ্ধে আন্দোলন বা সংগ্রাম করেও তাদের কাছ থেকে বিন্দুমাত্র ন্যয়বোধের পরিচয় পাওয়া না যায় তাহলে নির্যাতিত সমাজকে ভাল করে ভেবে দেখতে হবে । তাই দীর্ঘ বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে আমাদেরকে আত্মসম্মান ও মানবিক অধিকার লাভ করতে হলে হিন্দু ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। তিনি বল্লেন- আমার চরম দুভাগ্য যে , অস্পৃশ্য সমাজে জম্মেছি বলে আমাকে আত্মসম্মানহীন অপমানজনক সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে । তিনি দৃঢ়কণ্ঠে

ঘোষণা করেন যে ." আমি অস্পৃশ্য হয়ে জন্মগ্রহন করলেও অস্পৃশ্য হয়ে মরব না। "

**এই সম্মেলনে নিম্মোক্ত কতিপয় গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ঃ-**

১) অস্পৃশ্যদের সামাজিক সমতা লাভের আন্দোলনের প্রতি উচ্চবর্নের হিন্দুদের উদাসীনতা অথবা বিরোধিতাকে এই সম্মেলনে কঠোর ভাষায় নিন্দা জানায়।

২) হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী করার জন্য বিগত ১৫ বছর ধরে উচ্চবর্নের হিন্দুদের সংগে নির্যাতিত শ্রেণীর হিন্দুদের সমান সামাজিক অধিকার লাভের নিমিত্ত যে আন্দোলন ও সংগ্রাম তারা চালিয়ে আসছে তা এখন থেকে বন্ধ করা হবে ।

৩) অতঃপর তারা সমাজে সম্মানজনক ও সমানাধিকার লাভের জন্য ভারতের অন্য যে কোন ধর্ম গ্রহন করবে ।

ইয়োলা সম্মেলনে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত সমূহ প্রকাশিত হওয়া মাত্র বিভিন্ন ধর্মের নেতৃবর্গের কাছ থেকে এদের স্ব-স্ব ধর্ম গ্রহনের জন্য আহবান পত্র আসতে লাগল । তাঁর মধ্যে - মুসলিম নেতা কে, এল গৌড়া , বোম্বাই মেথডিষ্ট চার্চের বিশপ ব্রেনটন থোবার্ন ব্যাডলি , বারনসী মহাবোধি সোসাইটির সেক্রেটারী এবং অমৃতসরের স্বর্নমন্দির পরিচালক সমিতির সহ - সভাপতি প্রদীপ সিং প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও পত্র মারফত ডঃ আম্বেদকরের কাছে আবেদন জানান ।

ডঃ আম্বেদকরের ধর্ম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত সারা ভারতে প্রচন্ড আলোড়ন সৃষ্টি করল । এর প্রতিক্রিয়াস্বরুপ নানা জনে নানা মত ব্যক্ত করতে লাগলেন। গান্ধিজী ও সমমনা নেতৃবৃন্দ চিন্তা করলেন অস্পৃশ্যরা যদি হিন্দু সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে হিন্দুর সংখ্যা কমে যাবে এবং সেই অনুপাতে কংগ্রেসের শক্তি হ্রাস পাবে । আবার অনেকে আশংকা করলেন ডঃ আম্বেদকর যদি তার অনুগামীদের নিয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে তাহলে ভারতে মুসলমানদের শক্তি বেড়ে গেলে হিন্দুদের জন্য মারাত্মক হুমকী হয়ে দাঁড়াবে।

এ দিকে আম্বেদকরের ঘনিষ্ঠজন ডঃ সদানন্দ গ্যালভাঙ্করের বাড়ীতে ডঃ আম্বেদকরের সাক্ষাত প্রত্যাশায় আছেন হিন্দু মিশনারী নেতা মাসুরকর মহারাজ , ইয়োলা সম্মেলন শেষে আম্বেদকর সেখানে যান এবং মাসুরকরের সাথে দীর্ঘ আলোচনার এক পর্যায়ে আম্বেদকর জানালেন, একটা নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি উচ্চবর্ণের হিন্দুরা হিন্দুধর্ম থেকে অস্পৃশ্যতা তুলে নেয় তবে তারা হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করবেন না । তিনি মাসুরকরকে একটি প্রস্তাব দেন, জনৈক নির্যাতিত শ্রেণীর ধর্মীয় নেতা কে, কে শক্ত উচ্চবর্ণ হিন্দুদের কাছেও সৎ ও ন্যায়পরায়নতার জন্য গ্রহনযোগ্য ব্যক্তি। যদি শক্তকে এক বছরের জন্য শংকরাচার্যের পদে অধিষ্ঠিত করা হয় তাহলে নির্যাতিতরা বিশ্বাস করবে যে, অস্পৃশ্যদের প্রতি বর্ণহিন্দুদের মনমানসিকতা পরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু বর্ণ হিন্দুদের কাছে এই প্রস্তাবের কোন গুরুত্বই পেলনা ।

পরবর্তীতে অধ্যাপক এন, শিবরাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে শিবরাজ আম্বেদকরের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে বল্লেন, 'হিন্দু ধর্ম আজ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের কায়েমী স্বার্থের ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছে । এতএব এই ধর্ম পরিত্যাগ করা ছাড়া নির্যাতিতদের আর কোন উপায় নেই'। একই সম্মেলনে ডঃ আম্বেদকর বল্লেন, 'হিন্দু ধর্মের পুনর্জীবনের আর কোন সম্ভাবনা নেই, তাই অতীব দুঃখের সাথে আমাদেরকে হিন্দু ধর্ম থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে'।

# ইংরেজ সরকার কর্তৃক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব

১৯৩৯ সালের প্রথম দিকে ভাইসরয় তাঁর সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দিলেন। এই পদ্ধতিতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগদান করবে, কিন্তু রাজ্যে কোন দায়িত্বশীল সরকার থাকবে না । মনোনয়নের ভিত্তিতে প্রতিনিধি করা হবে ।

এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে বিবৃতি দেন কংগ্রেস সভাপতি নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু, মুসলিম লীগ এবং ইন্ডিপেনডেন্ট লেবার পার্টির পক্ষে ডঃ আম্বেদকর। হিন্দু মহাসভা এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানায়। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা সমালোচনা হচ্ছিল।

এই সময় কংগ্রেসের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও গান্ধিজীর সুক্ষ্ম ষড়যন্ত্রের কারনে সুভাষচন্দ্র বসু সভাপতির পদ ও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ইতিমধ্যে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে ভাইসরয় ভারতীয় যুক্তরাষ্ট গঠনের পরিকল্পনা আপাতত স্থগিত রাখেন।

বীর সাভারকর বল্লেন, আজ যে ব্রিটিশ সরকার পোল্যান্ডের নির্যাতিত জনগণের পক্ষে জার্মানীর বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে বলে ভারতীয়দের সমর্থন আদায় করতে চাচেছ তা একটি রাজনৈতিক কৌশল ছাড়া কিছুই নয়। ডঃ আম্বেদকর বল্লেন- পোল্যান্ড আজ মানবতার দোহাই পাড়লেও পোল্যান্ড এতদিন ধরে ইহুদিদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছে। আজ নির্যাতিত মানবতার প্রশ্ন তুলে ব্রিটিশেরা ভারতীয়দের সহযোগিতা কামনা করছে।

তৎকালীন ভরতীয় ভাইসরয় লর্ড লিন লিথগো অক্টোবর মাসে ভারতীয় নেতৃবর্গের সাথে সাক্ষাতে মিলিত হন। এদের মধ্যে ছিলেন

গান্ধিজী, নেহরু, ডঃ আম্বেদকর, জিন্নাহ, সাভারকর , বল্লব ভাই প্যাটেল , রাজেন্দ্র প্রসাদ , সুভাস চন্দ্র বসুর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, এ সাক্ষাতে ডঃ আম্বেদকর বল্লেন -পুনাচুক্তির ফলাফলে তারা খুবই ক্ষুদ্ধ এবং ভবিষ্যতে ভারতীয় সংবিধান সংক্রান্ত আলোচনা হলে তাঁদের আরো বক্তব্য আছে বলে জানিয়েছেন।

কিছুদিন পর ভাইসরয়ের বিবৃতি প্রকাশিত হলে কংগ্রেস অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং সমস্ত প্রদেশ থেকে তাদের মন্ত্রীসভা প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানিয়ে দেয় । এই ঘটনার পর ডঃ আম্বেদকর বিবৃতি দিলেন যে, গান্ধিজীর একনায়কত্বের মনোভাবই ভারতে সংখ্যালঘু সমস্যা সমাধানে সবচেয়ে বড় অন্তরায়।

১৯৩৯ সালের নভেম্বরে কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা সমুহকে পদত্যাগের নির্দেশ দেয়। এই পদত্যাগে উল্লসিত হয়ে জিন্না সাহেব এই দিনটিকে " মুক্তি দিবস " হিসেবে পালন করেন। ডঃ আম্বেদকর জিন্না সাহেবের মুক্তিদিবস পালনকে স্বাগত জানান ।

১৯৪০ সালে মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে মুসলিম লীগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ট অঞ্চল নিয়ে স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেয় । এপ্রিল মাসে রামগড়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সম্মেলনে ভারত বিভাগকে কোন ক্রমেই বরদাস্ত করা হবেনা বলে ঘোষণা করে । অদৃষ্টের নির্মম পরিহাস ! যে জিন্নাহ সাহেব এতদিন ভারতে হিন্দু মুসলিম ঐক্যের কথা বলে আসছিলেন, আজ তাঁরই নেতৃত্বে হিন্দু -মুসলমানের দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগের প্রস্তাব গৃহীত হল ।

কংগ্রেস আহুত পুনা অধিবেশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি প্রতিনিধিত্বমুলক জাতীয় সরকার গঠন করার শর্তের ভিত্তিতে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা দানের আশ্বাস দেয়া হলে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে ঘোর আপত্তি জানান । ক্রমে ক্রমে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে মতদ্বৈতা বেড়েই যাচ্ছিল।

১৯৪০ সালে ডঃ আম্বেদকরের " Thoughts on Pakistan" নামক গ্রন্থটি প্রকাশিত হলে ভারতীয় রাজনীতিতে বইটির প্রতিপাদ্য বিষয়কে

কেন্দ্র করে মারাত্মক ঝড়ো হাওয়ার সৃষ্টি হয়। এই গ্রন্থে ডঃ আম্বেদকরের লিখিত কিছু অংশের সারসংক্ষেপে হল-" সম্পূর্ণ লোক বিনিময় পূর্বক মুসলমানদের দাবির প্রেক্ষিতে তাদের জন্য পাকিস্তান সৃষ্টিই ভারতের সাম্প্রদায়িক সমস্যার একমাত্র বাস্তব ও স্থায়ী সমাধান। এ প্রসংগে তিনি তুর্কী, গ্রীস ও বুলগেরিয়ার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন।

দু'টি ভিন্ন শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানসিকতা সম্পন্ন জাতিকে নিয়ে একটি দেশ গড়ে উঠতে পারে না। যে হিন্দুরা নিজেদের একটি অংশকে হাজার হাজার বছরব্যাপী ঘৃণিত ও বঞ্চিত করে রেখেছে তাদের কাছে কোন ভরসায় মুসলমানরা উদারতা ও সমমর্যদার আশা করবে?

ডঃ আম্বেদকরের প্রস্তাবে জিন্নাসাহেবও ঐকমত্য পোষণ করেন। কিন্তু গান্ধিজীর নেতৃত্বাধীন কংগ্রেস সেদিন হিন্দ-মুসলমানের মধ্যে জাতিগত পার্থক্য খুঁজে পায়নি। তারা লোক বিনিময়ের এই প্রস্তাবকে অবাস্তব বলে উড়িয়ে দেয়। কংগ্রেসের এই গোয়ার্তামীর কারনে ১৯৪৭ সালে সংঘটিত হিন্দু মুসলিম সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষ হতাহত হয়েছিল, হাজার হাজার কোটি ডলারের সম্পদ বিনষ্ট হয়েছিল। সে সময় সংঘটিত রক্তপাত, হত্যা, লুণ্ঠণ, নারীধর্ষণ সহ নানাবিধ পাশবিক তান্ডবলীলা মানব সভ্যতাকে চরমভাবে কলুষিত করেছিল।

রাজনৈতিক অচলাবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আম্বেদকর গণভোট সংক্রান্ত একটি ফর্মূলা সরকারের কাছে পেশ করেন। মুসলমান প্রধান অঞ্চলে দু'টি গণভোটের ব্যবস্থা করাই এই ফর্মূলার বিষয়। প্রথম গণভোটে মুসলমানেরা ঠিক করবে তারা পাকিস্তান চায় কিনা। যদি মুসলিমেরা পাকিস্তান চায় তবে প্রস্তাবিত পাকিস্তানে অমুসলমানদের গণভোট হবে যে তারা পাকিস্তানে থাকতে চায় কিনা। যদি না চায় তাহলে উক্ত প্রদেশ চায় কিনা। যদি না চায় তাহলে উক্ত প্রদেশ সমূহে সীমানা কমিশন গঠন করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ নির্ধারন করা হবে এবং মুসলমানরা রাজী থাকলে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাসমূহ নিয়ে পাকিস্তান করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাঞ্জাব ভারতভূক্তিও ডঃ আম্বেদকরের উক্ত ফর্মূলার বাস্তবায়ন।

১৯৪৫সালে " Thoughts on Pakistan"এর দ্বিতীয় সংস্করণ Pakistan or Partition of India" গ্রন্থে কিছু নতুন অধ্যায় সংযোজিত হল। সংযোজিত নতুন অধ্যায়ে বলা হয়েছে- পৃথিবীতে এমন কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে একাধিক জাতি একই রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পুর্ণ স্বাধীন সত্ত্বা নিয়ে বসবাস করছে। উদাহরণস্বরূপ দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা, সুইজারল্যান্ড ইত্যাদি। সুতরাং পাকিস্তান সৃষ্টি না করেও মুসলমানরা একটা আলাদা জাতি হিসেবে স্বাধীন ভারতে সম্পূর্ন পৃথক সত্তা নিয়ে বসবাস করতে পারবে। সংবিধান রচনাকালে তাদের পৃথকসত্ত্বা সম্পর্কে সংবিধানসম্মত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখতে হবে।

## রাজনৈতিক কর্মকান্ড ও

## মন্ত্রী থাকাকালীন গৃহীত কার্য্যাবলী

১৯৪১ সালের জুলাইতে ভাইসরয় কয়েক জন ভারতীয়কে নিয়ে একটি প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা কমিটি এবং এক্সিকিউটিভ কডিন্সিল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। প্রতিরক্ষা পরামর্শদাতা কমিটিতে ডঃ আম্বেদকরকে অন্তর্ভূক্ত করলেও এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নির্যাতিত শ্রেণী ও শিখদের মধ্য থেকে কোন প্রতিনিধি না নেওয়ায় ডঃ আম্বেদকর বিট্রিশ সরকারের কাছে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন।

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমল থেকে শুরু করে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত নির্যাতিত শ্রেণীর যুবকদের নিয়ে গঠিত 'মাহার ব্যাটেলিয়ান' ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে দক্ষতা ও সাহসিকতার সহিত কাজ করে আসলেও বর্ণহিন্দুদের প্ররোচনায় অস্পৃশ্যতার ধূয়া তুলে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সরকারের এক আদেশ বলে অস্পৃশ্যদের সামরিক বাহিনীতে নিয়োগ বন্ধ করে দেওয়া হয়। ডঃ আম্বেদকরের আপ্রাণ চেষ্টায় বৃটিশ সেনাবাহিনীতে পুনরায় মাহারদের (অস্পৃশ্য) নিয়োগদান চালু করা হয়।

১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ষ্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতের

রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসন কল্পে ভারতে আসেন। ঐ সময়ে তিনি প্রস্তাব রাখেন যে, বর্তমান মহাযুদ্ধে ভারতবাসী যদি ব্রিটিশ সরকারের সহযোগিতা করে তাহলে যুদ্ধ বিরতির ৩ বছরের মধ্যে ভারতকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস' দেয়া হবে। তাঁর এই প্রস্তাব নির্যাতিত শ্রেণীর প্রতিনিধি আম্বেদকরসহ অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও তেমন গুরুত্ব দিলেন না।

তবে ৩০শে মার্চের এক সাক্ষাতকারে ক্রিপস ডঃ আম্বেদকরকে ইনডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির নেতা, না নির্যাতিত শ্রেণীর নেতা হিসেবে তাঁর সাথে আলোচনা করছেন এই প্রশ্ন করলে ডঃ আম্বেদকরকে একটি সমস্যায় ফেলে দেন। তিনি সেদিনই তার অনুগামী ও তফসিলী নেতাদের নিয়ে দিল্লীতে এক বৈঠকে বসলেন। সারা ভারতের তফসিলীদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলার উপর এ বৈঠকে গুরুত্বারোপ করা হয় এবং ১৮ ও ১৯শে জুলাই সারা ভারত তফসিলী সম্মেলনের দিন ধার্য করা হয়।

১৯৪২ সালে ১৪ই এপ্রিলে বোম্বাইতে ৯দিনব্যাপী ডঃ আম্বেদকরের ৫০তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ তাঁর সার্থক কার্যাবলী ও নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বিভিন্ন পত্র পত্রিকাও একই মত পোষণ করে। ডঃ আম্বেদকর এমন একজন ক্ষণজন্মা রাজনীতিবিদ যিনি সাফল্যের বেদীমূলে কখনো বিবেককে জলাঞ্জলী দেননি বলেও কোন কোন পত্রিকা মন্তব্য করে।

২রা জুলাই ভাইসরয় তার এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে আরো ৫জন সদস্য অন্তর্ভূক্ত করলে নির্যাতিত শ্রেণীর পক্ষে এই প্রথম ডঃ আম্বেদকর ভারত সরকারে অন্তর্ভূক্ত হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম দপ্তরের মত একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের দায়িত্বে আসীন হলেন।

১৮ ও ১৯ জুলাই পূর্ব ঘোষণানুযায়ী যথারীতি নাগপুরে সারাভারত তফসিলী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনে মাদ্রাজ, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রভৃতি প্রদেশ থেকে আগত তফসিলী প্রতিনিধিদের সংখ্যা ছিল ৭০ হাজারেরও অধিক।

সম্মেলনে ডঃ আম্বেকর তাঁর ভাষণে বলেন, তফসিলীরা হিন্দুধর্মের অন্তর্ভূক্ত হলেও জাতীয় ও রাজনেতিক জীবনে তাদের একটা পৃথক সত্তা আছে যা হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থেও স্বীকৃত। গান্ধিজীর মত বর্ণহিন্দু স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠিরা তফসিলীদের পৃথক সত্তাকে অস্বীকার করে আত্মসাৎ করার চক্রান্তে লিপ্ত। তফসিলীদের পৃথক জাতিসত্তার ভিত্তিতে এই সম্মেলনে তাদের রাজনৈতিক সংগঠন "All India scheduled castes Federation" গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হিন্দু সমাজের অন্তর্ভূক্ত হাজার হাজার বছর ধরে লাঞ্ছনা, বঞ্চনা, ঘৃণা ও শোষনের শিকার কথিত অস্পৃশ্য জনগণকে শিক্ষিত, সংগঠিত এবং সামাজিক, রাজনৈতিক ও সরকারী চাকরীর ক্ষেত্রে ন্যায় সংগত অধিকার আদায়ের জন্য এই সদ্য গঠিত ফেডারেশন সারা ভারতব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার পবিত্র শপথ গ্রহণ করে।

উক্ত সম্মেলন চলাকালীন সময়ে আরও দুটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। একটি তফসিলী মহিলা সম্মেলন। যার নেতৃত্ব দেন শ্রীমতি সুলোচনাবাঈ ডোঙ্গার এবং অন্য সম্মেলনটি সমতা সৈনিক দলের। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সরদার গোপাল সিংহ। তফসিলী মহিলা সম্মেলনে শ্রীমতি ইন্দিরাবাঈ পাতিল ও শ্রীমতি কীর্তিবাঈ পাতিলের নামও উল্লেখযোগ্য।

পার্টিকে সুসংগঠিত করে গড়ে তুলতে ডঃ আম্বেদকর অক্লান্তভাবে সারা ভারতে ঘুরে ঘুরে সভা, সম্মেলন ও বৈঠকের মাধ্যমে পার্টির নীতি, উদ্দেশ্য, আদর্শকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে সচেষ্ট হলেন।

১৯৪৩ সালের ১৯শে জানুয়ারী পুনাতে অনুষ্ঠিত রানাডের জন্ম জয়ন্তীতে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে ভাষণদানকালে তিনি রানাডে, গান্ধী ও জিন্নার নেতৃত্বের তুলনামুলক দীর্ঘ বক্তৃতামালায় গান্ধীজীর মানবপ্রেমকে ভন্ডামীর নামান্তর বলে উল্লেখ করেন। পরে উক্ত বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৯৪২ সালের আগষ্ট মাসে 'ভারত ছাড়' ধ্বনি তুলে কংগ্রেস ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের ডাক দেয় এবং পরে দেশবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের নিমিত্তে গান্দিজী পুনার আগা খাঁ প্রাসাদে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে ২১দিনের অনশন শুরু করেন। ডঃ আম্বেদকর তখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকায় তার

উপর কংগ্রেসী নেতাদের প্রবল চাপ সৃষ্টি হয়। এতে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

তিনি শ্রমিকদের জীবনের মানোন্নয়নের কথা চিন্তা করে Joint Labour Management committee" গঠন করেন এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শ্রমিকদের কর্মপ্রাপ্তির সুবিধার জন্য " Employment Exchange" গঠন করেন। তাছাড়া শ্রমিকদের বেতন, বাসস্থান, শিক্ষা সংস্কৃতি সম্পর্কিত অবস্থা অনুসন্ধানের নিমিত্ত কমিশন গঠন করেন।

কংগ্রেস, মুসলিম লীগ ও তফসিলী ফেডারেশন এই তিন পক্ষের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক শান্তিপূর্ণ ভাবে ভারতের স্বাধীনতা হস্তান্তরের জন্য ডঃ আম্বেদকর " ত্রি-পাক্ষিক চুক্তির" ফরমূলা উপস্থাপন করলেন। এই ফরমূলাকে জনগণের দাবীতে পরিণত করার জন্য তফসিলী অধ্যুষিত অঞ্চল সমূহে বিভিন্ন সভা সম্মেলনের মাধ্যমে তফসিলীদের সংগঠিত করতে সচেষ্ট হলেন।

১৯৩৫ সালে জুন মাসে ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের নিয়ে সিমলাতে এক বৈঠক আহবান করেন। এই বৈঠকে কংগ্রেসের পক্ষে মৌলানা আজাদ, মুসলিম লীগের পক্ষে জিন্নাহ, তফসিলী ফেডারেশনের পক্ষে এন, শিবরাজ বৈঠকে যোগদেন। ডঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের সদস্য হওয়ায় বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি তবে ফেডারেশনের বক্তব্য তিনি লিখে দিয়ে এন শিবরাজকে বৈঠকে পাঠান। এই বক্তব্যে দাবী করা হয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে মুসলিম সদস্য যদি ৫জন নেয়া হয় তাহলে তফসিলীদের থেকে কমপক্ষে ৩জন সদস্য নেয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত বৈঠকের আলোচনা ফলপ্রসু হয়নি।

ঐ বছরের জুন মাসে 'What Congress and Gandhi have done to the untouchables?'- নামক ডঃ আম্বেদকরের এই প্রসিদ্ধ গ্রন্থখানি প্রকাশিত হলে ভারতীয় রাজনীতিতে এক অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

সে বৎসরের জুলাই মাসে ইংল্যান্ডের সাধারণ নির্বাচনে টোরীদের ভরাডুবি হলে শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হয়। ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল ১৯৪৬ সালে ভারতেও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কথা ঘোষনা করেন। এই

ঘোষনার পর পরই ভারতের রাজনৈতিক আবহাওয়াও উত্তপ্ত হতে লাগল। নির্বাচনী প্রস্তুতিই বড় বড় রাজনৈতিক দলের একমাত্র মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়াল। ডঃ আম্বেদকরের তফসিলী ফেডারেশন (All India Scheduled castes Federation) আর্থিক ও সাংগঠনিক দিক থেকে এখনও নড়বড়ে। তবু পুনাতে এক নির্বাচনী সভা আহবান করলেন। এই সভায় আম্বেদকর বল্‌লেন- ধনিক শ্রেণী ও স্বার্থান্ধ হিন্দুদের সংগঠন কংগ্রেসকে যেন তফসিলীরা কখনো বিশ্বাস না করে। রাজনৈতিক ক্ষমতা হচ্ছে একটি জাতির জীবনী শক্তি। নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তিকে করায়ত্ব করতে না পারলে কায়েমী স্বার্থবাদী বর্ণহিন্দুদের ক্রীতদাস হয়ে পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে হবে।

নভেম্বরে দিল্লীতে ৭ম বারের মত সারা ভারত শ্রমিক সম্মেলন আহুত হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতির ভাষনে ডঃ আম্বেদকর শ্রমিক প্রতিনিধিদের কাছে প্রশ্ন রাখেন- আপনারা দেশের শিল্পপতিদের জিজ্ঞাসা করেন যুদ্ধের জন্য ট্যাক্স দিতে তাদের আপত্তি থাকে না, অথচ শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের উন্নয়নের জন্য ট্যাক্স দিতে তাদের এত আপত্তি কেন?'

ইতিমধ্যে নির্বাচনী প্রচারণা খুব তুঙ্গে উঠল। সবাই যার যার সংগঠনের প্রচারনায় ব্যস্ত। গান্ধিজী রাজা গোপালচারীর মাধ্যমে মুসলিম লীগের সাথে আঁতাত করার কৌশল অবলম্বন করেছেন। তাঁর প্রধান লক্ষ্য হল ডঃ আম্বেদকর এবং তাঁর নেতৃত্বাধীন তফসিলী সংগঠনকে ঠেকানো।

নির্বাচন শুরু হলে কুখ্যাত ঐতিহাসিক পুনা চুক্তির কুফল তফসিলীদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে অধিকাংশ সংরক্ষিত আসনের প্রায় আসনই কংগ্রেসের করায়ত্ব হল। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলে কংগ্রেস সবকটি আসনই হারাল। দুঃখজনক যে ডঃ আম্বেদকরের তফসিলী ফেডারেশনও কংগ্রেসের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হল।

এই নির্বাচনের পর ইংল্যান্ড থেকে ষ্ট্যাফোর্ড ক্রীপস, এ, ভি আলেকজান্ডার ও ভারত সচিব লর্ড পেথিক লয়েন্স সহ ৩ জনের একটি ক্যাবিনেট মন্ত্রীর মিশন ১৯৪৬ সালের ২৪শে মার্চ দিল্লীতে এলেন এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করেন। ৫ই এপ্রিল

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি ডঃ আম্বেদকর ও মাষ্টার তারা সিং- এর সাথেও কথা বলেন- আম্বেদকর তফসিলীদের পৃথক নির্বাচন সহ বিভিন্ন দাবী সম্বলিত একটি স্মারক লিপি ঐ মিশনের কাছে পেশ করেন। নির্বাচনে পরাজিত এই নেতৃদ্বয়ের দাবী তেমন গুরুত্ব পায়নি।

সীমাহীন দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিমজ্জিত সমাজ ও পরিবারে জন্মগ্রহণ করা এই লোকটির সাথে শ্রমিকদের দৈনন্দিন জীবনের দুঃখ দুর্দশা ও ক্লেশকর জীবন যাপনের একটি ঘনিষ্ঠ পরিচিতি ছিল। তাছাড়া বাল্য জীবন তো কেটেছে অসংখ্য শ্রমিক পরিবেষ্টিত বোম্বাই বস্তি এলাকার দাদার চাওয়ালের সেই ছোট্ট ঘরে। তাই জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এই মানুষটি তো সমাজের মেহনতি শ্রমজীবি, দরিদ্র অবহেলিত বঞ্চিতদের প্রতি দুর্বল থাকবে এটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হল। তিনি ১৯৪২ সালের ২রা জুলাই বিট্রিশ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের শ্রম মন্ত্রীর পদে যোগদান করলেন। এই পদে যোগাদন উত্তর তিনি ভারতের শ্রমিক ও মহিলা শ্রমিকদের উন্নতি ও কল্যাণের জন্য তাঁর ক্ষমতার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই দেখা গেছে শ্রমিকরা যুগ যুগ ধরে আন্দোলন করেই তাদের অধিকার আদায় করতে সক্ষম হয়েছে আর ভারতের শ্রমিকেরা যেন না চাইতে পেয়ে গেল।

ডঃ আম্বেদকর ৪ বৎসর যাবৎ শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন নারী, শিশু শ্রমিকসহ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র শ্রমিক সমাজের কল্যাণে নিম্নোক্ত অধিকারসমূহ বাস্তবায়ন করেছেনঃ-

১) শ্রমিকদের বিষয়ে যে কোন আলোচনায় আগে শুধু সরকার পক্ষ এবং মালিকপক্ষ বসতেন। ডঃ আম্বেদকর শ্রমমন্ত্রী থাকাকালীন ঘোষণা করলেন শ্রমিক সম্পর্কিত যে কোন আলোচনায় শ্রমিক প্রতিনিধিও যোগদান করতে পারবেন। এই পদ্ধতির নাম 'ত্রি-পাক্ষিক' শ্রম আলোচনা।

২) আমেরিকা ও ইংল্যান্ডের ন্যায় ভারতেও "Joint Labour Management Committee" "যৌথ শ্রম পরিচালনা কমিটি গঠন করেন।

৩) বিভিন্ন অফিস, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানায় প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক সমিতিকে অধিকার দানের উদ্দেশ্যে "Trade Union" এর স্বীকৃতি

দানের আইন পাশ করেন।

৪) শ্রমিকদের কাজের সময় ১০ঘন্টা থেকে কমিয়ে ৮ ঘন্টা ধার্য করা হয় এবং ৮ ঘন্টার বেশী কাজ করলে "Over time salary" প্রদানের আইন পাশ করা হয়।

৫) শ্রমিকদের বেতন, বাসস্থান, খাদ্য, শিক্ষা, পোষাক আষাক ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে খোঁজ খবর রাখার জন্য 'শ্রম অনুসন্ধান সমিতি' গঠন পূর্বক তাদের উন্নয়নের অনেকগুলি আইন পাশ করা হয়।

৬) 'কারখানা সংশোধনী বিল' পাশের মাধ্যমে শিল্প ও কারখানা শ্রমিকদের সবেতন ছুটির ব্যবস্থা চালু করেন। এতে প্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কর্মচারীরা বছরে ১০দিন এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শ্রমিক কর্মচারীরা বছরে ১৪দিন সবেতন ছুটি ভোগ করতে পারবেন। এর আগে সাপ্তাহিক ছুটি ছাড়া অন্যান্য দিন ছুটি ভোগ করলে মালিক কর্তৃক বেতন কর্তন করে নেয়া হত।

৭) নারী শ্রমিক কর্মচারীদের সাথে পুরুষ শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বৈষম্যের বিলোপ সাধন। একই কাজের জন্য নারী পুরুষ সমহারে বেতন পাবেন।

৯) কয়লা শ্রমিকদের আর্থিক উন্নয়নকল্পে 'কয়লা খনি শ্রমিক উন্নয়ন তহবিল' গঠনের আইন পাশ।

১০। প্রসবকালীন 'Maternity Leave' ছুটির আইন বিধিবদ্ধ করেন।

# সংবিধানের মূল স্থপতি ডঃ আম্বেদকর

১৯৪৭ সালের ১৫ই জুলাই বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক "স্বাধীন ভারত" হিসেবে আইন পাশ করা হলে গণপরিষদ সার্বভৌম ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। দেশ বিভাজনের ফলে গণ পরিষদও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। ডঃ আম্বেদকর যেহেতু পূর্ব পাকিস্তানের ভোটার কর্তৃক জয়লাভ করে গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেহেতু দেশ বিভাজনের ফলে তার সদস্যপদও খারিজ হয়ে যায়। তবে আশার কথা যে, এই সময় ডঃ এম, আর জয়াকর গণপরিষদ থেকে পদত্যাগ করায় ডঃ আম্বেদকর কংগ্রেসের সমর্থনে পুনরায় মহারাষ্ট্র থেকে গণ পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন।

এদিকে ভারতের জাতীয় পতাকা তৈরীর দায়িত্ব ডঃ আম্বেদকরের উপর ন্যস্ত হবার সুযোগে সর্বকালের রাজর্ষি সম্রাট অশোকের রাজকীয় স্মারক 'অশোক চক্র' জাতীয় পতাকায় অন্তর্ভূক্ত করেন।

২৯শে আগষ্ট গণপরিষদ কর্তৃক সর্বশ্রী কৃষ্ণস্বামী আয়ার, এন ধাবরাও,স্যার বি, এন, রাও, যুগল কিশোর খান্না, সৈয়দ সাদুল্লা, এস, এন মুখার্জী ও কেবলকৃষ্ণকে সদস্য এবং ডঃ আম্বেদকরকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করে একটি খসড়া সংবিধান কমিটি গঠন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি খসড়া সংবিধান সম্পূর্ণ করে গণপরিষদের সভাপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের কাছে হস্তান্তর করেন। অতঃপর সংবিধানটি জনমত যাচাইয়ের জন্য ৬মাস সময় নেওয়ার পর ১৯৪৮ সালের ৪ঠা নভেম্বর ডঃ আম্বেদকর খসড়া সংবিধানটি গণপরিষদে পেশ করেন।

এই সংবিধান ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তৈরীর জন্য যত বেশী সম্ভব চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও বলতে হয়, সংবিধান রচনা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নীতিবিরোধী কিছু কিছু ধারা পার্টির হাই কমান্ডের চাপের মুখে সংযোজন করতে হয়েছে। বিশেষ করে কংগ্রেসের প্রভাবশালী নেতাদেরও পরামর্শ শুনতে হয়েছে। তাই অনেক সময় নিজেদের অভিরুচি ও স্বাধীন বিবেচনা মাফিক কাজ

করতে পারেননি বলে সংবিধান কমিটির সদস্য এম, সাদুল্লা ও অনেকেই স্বীকার করেন।

সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অংশটি হল চতুর্থ অধ্যায় যা রাজ্যের কর্মপদ্ধতির নির্দেশমূলক নীতিসমূহ নামভূক্ত। এই অধ্যায়ের মাধ্যমে ডঃ আম্বেদকরের সমাজ তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ফুটে উঠেছে। তিনি সমাজ তান্ত্রিক অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভূক্ত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কংগ্রেস গণপরিষদকে চাপ প্রয়োগ করায় শ্রমজীবি মানুষের ন্যায় সংগত অধিকারগুলোকে মৌলিক অধিকারভূক্ত, না করে নির্দেশমূলক নীতির অন্তর্ভূক্ত করা হয়। এই অধ্যায়ের আরও কতিপয় বিষয় হল- প্রতিটি নাগরিকের জীবিকার অধিকার, পুঁজিবাদ বিরোধী ব্যবস্থা, জাতীয় আয়ের সুষ্ঠ বন্টন। নারী পুরুষের সম অধিকার, ১৪ বৎসর পর্যন্ত প্রতিটি ছেলে মেয়ের জন্য বাধ্যতামুলক অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, আদিবাসী তফসিলী ও পশ্চাৎপদ শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ও জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার প্রবর্তন ইত্যাদি।

২৫শে নভেম্বর খসড়া সংবিধানের বিতর্ক অধিবেশনে বক্তৃতা কালে ডঃ আম্বেদকর জানান, "তিনি গণপরিষদে এসেছিলেন আদিবাসী তফসিলী, পশ্চাৎপদ শ্রেণী ও শোষিত শ্রমজীবিদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। তাঁকে খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য এবং চেয়ারম্যান নির্বাচিত করায় তিনি গণপরিষদের কাছে বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং খসড়া তৈরীর ক্ষেত্রে বি, এন, রাও সাক্সেনা, শাহ, কামাথ, দেশমুখ, পন্ডিত ঠাকুরদাস, সিদ্ধ ও কুজুরু প্রমুখ ব্যক্তি বর্গের সহযোগিতার কথা তিনি শ্রদ্ধাচিত্তে স্বীকার করেন।

উপসংহারে তাঁর বক্তৃতার সারগর্ভ বিষয় হল- 'এই সংবিধানের দ্বারা দেশবাসীকে সুষ্ঠ রাজনৈতিক গণতন্ত্রের অধিকার দিলাম। কিন্তু আর্থ-সামাজিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত না হলে রাজনৈতিক অধিকার আদায় সম্ভব নয়।'

১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর গণপরিষদ কর্তৃক খসড়া সংবিধানকে স্বাধীন ভারতের সংবিধান হিসেবে গ্রহণ করে সভাপতির ভাষনে ডঃ রাজেন্দ্র

প্রসাদ ডঃ আম্বেদকরকে খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান নির্বাচন করাকে একটি নির্ভুল সিদ্ধান্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি বলেছিলেন, 'আমি সভাপতি হিসেবে বলতে চাই, আমরা ভারতের সবচেয়ে যোগ্যতম ব্যক্তির হাতেই আমাদের ভবিষ্যৎ সংবিধান রচনার ভার অর্পন করেছিলাম।'

## প্রথম সাধারণ নির্বাচন ও পার্লামেন্টে বিরোধী ভূমিকা

১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে সক্রিয় অংশগ্রহনের নিমিত্তে তফসিলী ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় (দিল্লীতে) নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরী করা হল এবং সোস্যালিস্ট পার্টির সংগে একত্রে নির্বাচন পরিচালনা করার এক সমঝোতাও হল।

১৮ই নভেম্বর ডঃ আম্বেদকর বোম্বাই ফিরে আসার পর তফসিলী ফেডারেশন ও সোস্যালিষ্ট পার্টি যৌথভাবে তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়। বোম্বাইয়ের চৌপাটিতে অন্য এক বিশাল জনসভায় তিনি বল্লেন, 'এ কথা মনে করা ভুল হবে যে, কংগ্রেস দেশের স্বাধীনতা এনেছে। দেশকে স্বাধীন করার সম্মান প্রকৃতপক্ষে সুভাষ চন্দ্র বসুরই প্রাপ্য। অপরপক্ষে কংগ্রেসের অবদান হল স্বাধীন ভারতে একটি দূর্নীতি পরায়ন সরকারের জন্মদান।'

১৯৫১ সালের ২৫শে নভেম্বরে এক নির্বাচনী সভায় ডঃ আম্বেদকার বল্লেন-নেহেরু যদি প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্র বিশ্বাস করেন তাহলে ধনিক শ্রেণীর পার্টি কংগ্রেস ত্যাগ করে সোস্যালিষ্ট পার্টিতে যোগদান করে দেশকে সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিচালনা করার দায়িত্ব নিতে পারেন।

এদিকে ডঃ আম্বেদকর ব্রিটিশ সরকারের শ্রমমন্ত্রী এবং নেহেরু সরকারের আইন মন্ত্রীর দায়িত্বে থাকার ফলে প্রায় দশ বছরাধিককাল সাংগঠনিক কাজে কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে না পারায় পার্টির ভিত অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আবার শারীরিক অসুস্থতাও তাঁর বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। এদতসত্ত্বেও 'তফসিলী ফেডারেশন' নির্বাচনী প্রচারনা পুরোদমে চালিয়ে যেতে লাগল।

১৯৫২ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনে ডঃ আম্বেদকর পেয়েছেন ১,২৩,৫৭৬ ভোট এবং কংগ্রেস প্রার্থী কাজরোল কর পেয়েছেন ১,৩৭ ৯৫০ভোট। অর্থাৎ ১৪,৩৭৪ ভোটের ব্যবধানে আম্বেদকর কংগ্রেস প্রার্থীর কাছে পরাজিত হন। তবে কংগ্রেসের অপপ্রচারনায় বিভ্রান্ত হয়ে প্রায় ৫০ হাজারেরও বেশী তফসিলীদের ভোট নষ্ট হয়েছে। এই নির্বাচনে তাঁর প্রধান অনুগামী রাজভোজ পার্লামেন্টে এবং বি, সি, কাম্বলে বিধান সভায় নির্বাচিত হয়ে পার্টির মর্যাদা রক্ষা করেছেন। এই পরাজয়ে ডঃ আম্বেদকর হাল ছেড়ে না দিয়ে মার্চে অনুষ্ঠিতব্য রাজ্য সভার নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। এতে রাজভোজ এবং অন্যান্য তফসিলী নেতাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় মার্চে অনুষ্ঠিত রাজ্য সভার নির্বাচনে জয়ী হয়ে পুনরায় সংসদীয় রাজনীতিতে ফিরে আসলেন।

১৯৫২ সালের মে মাসে রাজ্য সভার অধিবেশনে বাজেট বক্তৃতায় তিনি বল্লেন- প্রতিরক্ষা বাজেটের বরাদ্ধ ৫০ কোটি টাকার অধিক হওয়া উচিৎ নয়। বাকী অর্থ দিয়ে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়া যেতে পারে।

সে বৎসরই আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডঃ আম্বেদকরকে স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার স্বীকৃতিস্বরূপ ডক্টর অব-ল উপাধি দান করে।

উপাধি প্রাপ্তি উত্তর অভিনন্দন অনুষ্ঠানে বোম্বাইয়ের সিদ্ধার্থ কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ পতঙ্কর দুঃখ প্রকাশ করে বললেন যে, ভারতে এত বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে আম্বেদকরকে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য ডক্টর অব-ল উপধি প্রদান করল আমেরিকার একটি বিশ্ববিদ্যালয়। এ কথা চিন্তা করলে মাথা হেট হয়ে যায়।

১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে আম্বেদকরের বহুমুখী প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ হায়দ্রাবাদের ওসমানিয়া(মুসলিম) বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি, লিট-উপাধি প্রদান করে। ভারতের কোন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর প্রতিভার মূল্যায়ন করেনি।

১৯৫৩ সালের ৯ই সেপ্টম্বর 'সম্পত্তি কর বিল' সম্পর্কিত বিতর্কে আলোচনা কালে তিনি কথায় কথায় যে কোন ঘটনাবলীতে ইউরোপকে অনুসরণ না করার জন্য ভারতবাসীকে সতর্ক থাকার অনুরোধ করেন।

পেপসুতে রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থার ফলে সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারার লংঘনের অভিযোগ আনেন এবং সাধারন নির্বাচনে পরাজিত হওয়া সত্ত্বেও মোরারজী দেশাইকে বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী নিযুক্ত করায় ডঃ আম্বেদকর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর সেশনে রাজ্য সভায় বিতর্ককালে ডঃ আম্বেদকর তফসিলীদের দলন, নিপীড়নের বিরুদ্ধে স্বারাষ্ট্র মন্ত্রী কার্টজুর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন এবং তফসিলীদের রক্ষাকবচ হিসেবে রাজ্যসভায় একটি বিল আনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীকে অনুরোধ জানালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উত্তরে জানালেন তিনিই তো (ডঃ আম্বেদকর) সংবিধান রচনা করেছেন। ডঃ আম্বেদকর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কথা শুনে ক্ষোভের সহিত বললেন, 'অনেকক্ষেত্রে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে সংবিধানে অনেক কথা লিপিবদ্ধ করতে হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমি ছিলাম একজন ভাড়াটে সংবিধান প্রণেতা।'

ভান্ডারা লোকসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালের মে মাসের প্রথম দিকে। নির্বাচনে কংগ্রেসের তফসিলী প্রার্থীর কাছে সামান্য ভোটের ব্যবধানে ডঃ আম্বেদকর পরাজিত হন।

আম্বেদকর রাজ্যসভার অধিবেশনের নিয়মিত বিতর্ক কালে ১৯৫৪ সালের ২৬শে আগষ্টে প্রদত্ত ভাষনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এ সময় প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর তিনটি প্রধান বৈদেশিক নীতির কঠোর সমালোচনা করেন। বৈদেশিক নীতিসমূহ হল- ১) শান্তিনীতি ২) সাম্যবাদী শিবির ও গণতান্ত্রিক শিবিরের সংগে সহ অবস্থানের নীতি এবং ৩) সিয়াটো বিরোধী নীতি।

১৯৫৪ সালের ৬ই সেপ্টেম্বরে তফসিলী ও উপজাতি কমিশনারের রিপোর্টের বিতর্কে তিনি বল্লেন 'বছর বছর সংবিধান সংশোধন না করে সমস্ত পতিত জমি রেকর্ডভূক্ত করে ভূমিহীন তফসিলী কৃষকদের কাছে বন্টন করা হোক। তাছাড়া জোতদার ও জমিদারের জমি রাখার সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দিয়ে অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন তফসিলীদের মধ্যে বন্টনের পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও সরকারের কাছে প্রস্তাব রাখেন।

১৯৫৪ সালের ২৯শে অক্টোবর তফসিলী সমাজের মহান নেতা আম্বেদকরের হীরক জয়ন্তী পালনের জন্য তফসিলী ফেডারেশনের সভাপতি

আর, ডি ভান্ডারে কর্তৃক ১৯৫১ সালে গঠিত হীরক জয়ন্তী উদযাপন কমিটির কাছে ১,১৮,০০০/-টাকা দান করা হয়। ডঃ আম্বেদকর এই অর্থ দাদারে একটি পাবলিক হল এবং একটি উন্নত গ্রন্থাগার স্থাপনের কাজে ব্যয় করবেন বলে ঘোষনা দেন।

## হিন্দু কোড বিল ও মন্ত্রীত্ব থেকে পদত্যাগ

হিন্দু আইনের সংস্কারের নিমিত্তে ১৯৪১ সালের দিকে একটি কমিটি গঠন করে 'হিন্দু কোড বিল' নামে একটি খসড়া বিল তৈরী করে। 'হিন্দু কোড বিল' বিশেষতঃ হিন্দু নারী সমাজের কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রচলিত ধর্মীয় বিধানের সংস্কার। ১৯৪৭ সালে ডঃ আম্বেদকর কেন্দ্রীয় সরকারের আইন মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন সময়ে হিন্দু কোড বিল তার হস্তগত হলে তিনি এই বিলকে আরো ঢেলে সাজালেন। বিশেষ করে যৌথ পরিবারের ক্ষতিকর প্রভাব, মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ও বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি নতুনত্ব আনতে চাইলেন। এতে হিন্দু গোঁড়া পন্থীরা তাঁর উপর ক্ষুব্দ হলেন এবং প্রগতিবাদীরা তাঁকে স্বাগত জানালেন।

১৯৫১ সালের গোড়ার দিকে পার্লামেন্টের অধিবেশন বসার পূর্বে পর্যন্ত 'হিন্দু কোড বিল' নিয়ে তীব্র সমালোচনার ঝড় বয়ে যায়। পার্লামেন্টে হিন্দু কোড বিল পাশ না হলে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু তাঁর পদ থেকে প্রদত্যাগ করবেন বলেও ঘোষনা দেন। সরদার প্যাটেল ও ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বিলটির বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। ১৯৫১ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী ডঃ আম্বেদকর বিলটি পার্লামেন্টে পেশ করলেন। তিন দিন পর্যন্ত এই বিলটির উপর প্রচন্ড বিতর্ক চলার পর অবশেষে বিলটি মূলতবী রাখা হয়।

এপ্রিল মাসে দিল্লীতে আম্বেদকর ভবনের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠানে ডঃ আম্বেদকর তফসিলীদের প্রতি সরকারের বিরূপ মনোভাবের অভিযোগ তুলে বক্তব্য রাখলে মন্ত্রী সভায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। প্রধানমন্ত্রী নেহেরু আম্বেদকরকে তাঁর অসন্তোষের কথা জ্ঞাপন করেন এবং মন্ত্রী সভা পুনর্গঠনের নিমিত্তে পদত্যাগ করার কথাও ব্যক্ত করেন। এই পরিস্থিতিতে ডঃ আম্বেদকর তাঁর অনুগামীদের সাথে আলোচনার জন্য বোম্বাই রওনা দিলেন। তাদের

সাথে আলোচনা করে পার্লামেন্টের পরবর্তী অধিবেশনে 'হিন্দু কোড বিল' পাশ না হওয়া পর্যন্ত পদত্যাগ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

কংগ্রেসের পার্লামেন্টারী বোর্ডেও অধিকাংশ সদস্য বিলটির বিরোধিতা করেন তাই নেহেরুকে বাধ্য হয়ে বিলটি সম্পর্কে পার্লামেন্টে স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অনুমতি দিতে হল। শেষ পর্যন্ত বিলটি দু অংশে বিভক্ত করে এক অংশকে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিধি নামে পার্লামেন্টে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয। ডঃ আম্বেদকরও এতে সম্মতি দিলেন। তবে এই অংশের আলোচনার জন্য ১৭ই সেপ্টেম্বর পার্লামেন্টে উত্থাপন করলে অনেকেই বিলটির তীব্র বিরোধিতা করেন।

এন, ভি গ্যাডগিল, পন্ডিত কুঞ্জরু ও মহিলা সদস্যরা বিলটির সমর্থনে বিতর্কে অংশগ্রহন করেন। যুক্তি তর্কের এক পর্যায়ে ডঃ আম্বেদকর রাম সীতা সম্পর্কে একটি মন্তব্য প্রকাশ করলে সারা পার্লামেন্ট ক্ষোভে ফেটে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ডঃ আম্বেদকর তাঁর মন্তব্য প্রত্যাহার করে নিলেন। পার্লামেন্টের ভিতরে বাইরে তীব্র অসন্তোষের কারণে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ডঃ আম্বেদকরকে বিলটি তুলে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালে বিলটি আর পাশ করানো সম্ভব হয়নি।

আত্ম মর্যাদা সম্পন্ন ডঃ আম্বেদকর এই ঘটনায় খুবই আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর তাঁর পদত্যাগের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেন এবং কয়েকটি সরকারী বিলে তাঁর বক্তব্য রাখার বিষয়টি পূর্ব থেকে স্থির করা ছিল বিধায় তিনি সৌজন্যের খাতিরে উক্ত বিল গুলোর উপর আলোচনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সরকারকে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

ডঃ আম্বেদকর ১৯৫১ সালের ১১ই অক্টোবর পার্লামেন্টে তার বক্তব্য পেশ করতে এলেন, কিন্তু লোকসভার ডেপুটি স্বীকার আম্বেদকরের বক্তব্যের একটি কপি তাঁর কাছে জমা দিতে বলায় আত্ম সম্মানে প্রচন্ড ঘা লাগে এবং তিনি বক্তব্য না রেখে লোকসভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। পরের দিন সংবাদ পত্রে ৫টি বিশেষ কারণ উল্লেখপূর্বক তাঁর পদ ত্যাগের পূর্ণ বিবরণী প্রকাশিত হল।

# ধর্মান্তর পর্ব

১৯০৭ সালে বোম্বাইয়ের এলফিন ষ্টোন হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য ডঃ আম্বেদকরের সম্মানে আয়োজিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিক্ষক ও সমাজ সংস্কারক কৃষ্ণাজী অর্জুন কেলুস্কারের কাছ থেকে পাওয়া প্রীতি উপহার "গৌতম বুদ্ধের জীবনী গ্রন্থ" তাঁর কৈশরের কোমল হৃদয়ে গভীর রেখাপাত সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

তাছাড়া ভীমরাও উত্তরাধিকার সূত্রে একটি প্রচলিত ধর্মীয় আবহের মধ্যে থেকে বেড়ে উঠতে লাগলেন। পিতার নির্দেশ মত সে ধর্মের পাঠ্য রামায়ন মহাভারত থেকেও দৈনন্দিন কিংয়দাংশ পাঠ করতে হতো। এভাবে হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন উপাখ্যান সম্পর্কে তিনি যতই জ্ঞাত হতে লাগলেন ততই সে ধর্মের ধ্বজাধারী, ধারক, বাহক ও রক্ষকদের কর্তৃক শ্রেণী বৈষম্যের প্রাচীর গড়ে উচ্চাসনে অধিষ্ঠানে করতঃ তাদেরই সৃষ্ট নিম্নবর্ণ বা অস্পৃশ্যদের প্রতি অমানবিক আচরণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণ আম্বেদকরকে ক্রমে ক্রমে আত্মানুসন্ধানের দিকে ঠেলে দিয়েছে। এই আত্মানুসন্ধিৎসু মন এবং হিন্দু ধর্মীয় তত্ত্ব সম্পর্কে সুগভীর পান্ডিত্য পরবর্তী কালে সনাতন ধর্ম সম্পর্কে তার মনে নানা প্রশ্ন দানা বেঁধে উঠে। তাছাড়া ব্রাহ্মণ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের পুরাধা বিশিষ্ট মারাঠি নেতা জ্যোতিরাও ফুলেও ছিলেন আম্বেদকরের জীবনে প্রেরণার অন্যতম উৎস। যিনি ১৮৭২ সালে 'গোলামগিরি' নামে একটি যুগান্তকারী গ্রন্থ রচনা করে ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যবাদ শাসিত হিন্দুধর্মের সামাজিক অসাম্য, ধর্মীয় নানা কুসংস্কার, অপরদিকে বৌদ্ধধর্মের সাম্যবাদ এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্মীয় অনুশাসন অর্থাৎ সাম্য, মৈত্রী ও করুনার বাণী যেখানে মানুষে মানুষে, নারী পুরুষে নেই কোন ভেদাভেদ, যে ধর্মের অমোঘ বাণী এককালে ভারত ভূমিকে প্লাবিত করে বর্হিভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল অপ্রতিরোধ্য গতিতে। ভারত হল নতুন চৈতন্যবোধের চারণভূমি, পরিণত হল বিশ্বের অন্যতম তীর্থকেন্দ্রে। বৌদ্ধ স্থাপত্য, শিক্ষা সংস্কৃতি ও ভাস্কর্যের ছিল জয়জয়কার অবস্থা।

স্বার্থান্বেষী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তখন সমাজ জীবন থেকে সরে গিয়ে মন্দির অভ্যন্তরে আশ্রয় নিয়ে প্রতিশোধ স্পৃহায় সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলেন। পরবর্তীকালে বৌদ্ধদের মধ্যে অন্তর্কলহ দেখা দিলে তারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং ধীরে ধীরে বৌদ্ধধর্মের নির্যাস গ্রহণ করে বৌদ্ধদেরকে হিন্দুধর্মের আওতায় নিয়ে আসতে সমর্থ হয়। এক্ষেত্রে যারা বাঁধা সৃষ্টি করে বা হিন্দু ধর্ম থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখতে চেষ্টা করা করেছিল তারাই অস্পশ্য বলে ঘোষিত হল।

ইতিমধ্যে ডঃ আম্বেদকর ভারত এবং বর্হিভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, বর্তমানের ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী ব্যতীত হিন্দুধর্মের অন্যান্য সমস্ত শ্রেণীর প্রায় সকলেই এককালে বৌদ্ধ ছিলেন এবং আজকের অস্পৃশ্যরাই ছিলেন খাঁটি বৌদ্ধ।

ডঃ আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে দীর্ঘকাল ধরে ব্যাপক আন্দোলন করে আসছিলেন। যিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, ব্রাহ্মণ্যবাদী গোষ্ঠী অস্পৃশ্য জনগণকে একদিকে যেমন হিন্দু ধর্মীয় অধিকার দিতে নারাজ অন্যদিকে তাদেরকে হিন্দু বলে স্বীকৃতি দিতেও অনিচ্ছুক। ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত ইয়োলা সম্মেলনে অস্পৃশ্যদের সামাজিক মর্যাদা আদায়ের ব্যাপারে সর্বসম্মতিক্রমে কংগ্রেস তথা বর্ণবাদী হিন্দু সংগঠনগুলোর কাছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়িত না হলে হিন্দু ধর্ম ত্যাগের হুমকীও দেয়া হয়। তার ধারাবাহিকতায় ১৯৩৬ সালে ১৯শে এপ্রিল এক মিটিংয়ে 'হিন্দু ধর্ম ত্যাগ কমিটি' গঠিত হয়।

১৯৫৪ সালের অক্টোবর অল ইন্ডিয়া রেডিওতে ডঃ আম্বেদকরের 'আমার জীবন দর্শন' নামক এক বক্তৃতা প্রচারিত হয়। তিনি বল্লেন- তিনটি শব্দের মধ্যে আমার জীবন দর্শন খুঁজে পাই। যেমন- ১) স্বাধীনতা ২) সাম্য ও ৩) ভ্রাতৃত্ব। যদিও আমরা ভারতীয় সংবিধানে রাজনৈতিক কারণে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের নীতিকে গ্রহণ করেছি বস্তুত আমাদের সমাজ জীবনে এগুলোর কোন অস্তিত্ব নেই। এগুলো আমি বুদ্ধের বাণী থেকে গ্রহণ করেছি। হিন্দু ধর্মে স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের কোন স্থান নেই, তাই বুদ্ধের আদর্শ গ্রহণ করলে ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক আদর্শ পরস্পরের পরিপূরক হবে।

সে বৎসরের ডিসেম্বর মাসে ডঃ আম্বেদকর সস্ত্রীক তাঁর একান্ত সচিব মিঃ এস, ভি সবদকরকে সংগে নিয়ে রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় বৌদ্ধ-সম্মেলনে যোগদান করেন। সেখানে তাঁর বক্তৃতার আংশিক অংশ উদ্বৃত হল- 'বিশ্ববৌদ্ধ সংস্থা যদি সহায়তা করে তাহলে আমি বুদ্ধের জন্মস্থান ভারতে বুদ্ধের করুনা ও সাম্যের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করব'। আমরা অনেকেই অবগত আছি যে, ভারতীয় জাতীয় পতাকায় অশোক চক্র এবং জাতীয় প্রতীক হিসেবে আশোক স্তম্ভের প্রতিষ্ঠা এবং বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসকে সর্বভারতে সাধারণ ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টাতেই সম্ভব হয়েছে।

রেঙ্গুন থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পদিন পরেই লুনার নিকটবর্তী দেহু রোডে এক বৌদ্ধ বিহার নির্মান করেন এবং সেখানে রেঙ্গুন থেকে আনীত একটি বৌদ্ধ মুর্তি প্রতিস্থাপন করেন। মন্দির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০ হাজার জনতার উপস্থিতি ছিল এবং সে অনুষ্ঠানে তাঁর গবেষনামূলক গ্রন্থ 'বুদ্ধ ও তাঁর বাণী' অচীরেই প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছেন।

আম্বেদকরের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক ডি, বলিসিনা তাঁকে অভিনন্দন জানালেন।

এর মধ্যে জাপানের অন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক সংস্থার" প্রধান কর্মকর্তা ডঃ ফেলিক্স বলির সঙ্গে ডঃ আম্বেদকরের সাক্ষাত হলে ডঃ ফেলিক্স আম্বেদকরকে জাপানে অনুষ্ঠিতব্য সাংস্কৃতিক সংস্থার গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করতে আমন্ত্রণ জানান। পরে ডঃ আমম্বদকরের অনুরোধের প্রেক্ষিতে ভারত জাপান সংস্থার ব্যবস্থাপনায় জাপানের বিশিষ্ট দুইজন পন্ডিতসহ ফেলিক্স এপ্রিলে ভারত ভ্রমনে আসেন এবং উভয়েই বৌদ্ধধর্মের চর্চা ও প্রসার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

উক্ত আলোচনায় প্রাথমিক ভাবে বৌদ্ধভিক্ষুদের শিক্ষাদানের জন্য বাঙ্গালোরে একটি বৌদ্ধ শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সিদ্ধান্ত হল। ইতিমধ্যে তিনি বাঙ্গালারে মহিশূরের মহারাজা কর্তৃক তথায় ৫ একর ভূমিদানের প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন। উক্ত প্রতিশ্রুত জায়গায়তেই বৌদ্ধ শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। বিশ্ব বৌদ্ধ পরিষদ ও বৌদ্ধ শাসন পরিষদ শিক্ষক সরবরাহ ও আর্থিক সহায়তা দানের কথা ব্যক্ত করেছে। এটিকে

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক সংস্করণ বলে মনে করা হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, তিরিশের দশকে ডঃ আম্বেদকর ইটালীর প্রখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষু লোকনাথের সানিধ্যে এসেছিলেন বলেও জানা যায়। তাঁরা তিন দিন ধরে বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারতের অস্পৃশ্যদের নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেছিলেন এবং সে সময় অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে আম্বেদকরের ধিক্কারের কথাও প্রতিভাত হয়েছিল।

আম্বেদকরের স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে, শ্বাসকষ্ট চালিত কারণে তাঁকে প্রায়শঃ অক্সিজেন ব্যবহার করতে হচ্ছে। এতদসত্তেও তাঁর কার্যাবলী বা কলম থেমে থাকেনি। Revolution and Counter Revolution in India, Buddha or Karl Marx and The Riddless in Hinduism নামে কয়েকখানি গ্রন্থ রচনায় ও ব্যস্ত ছিলেন।

১৯৫৬ সালের প্রথম দিকেই তাঁর বিখ্যাত গবেষনামূলক গ্রন্থ " The Buddha and his Gospel" বুদ্ধ ও তাঁর বাণীর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়। ২৪শে মে বোম্বাইয়ের নারে পার্কে অনুষ্ঠিত বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে আগামী অক্টোবর মাসে আনুষ্ঠানিক ভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের কথা ঘোষনা করলেন। এই অনুষ্ঠানে তিনি হিন্দুধর্মের সাথে বৌদ্ধধর্মের পার্থক্য পরিস্কারভাবে ব্যক্ত করেন। সে বৎসরের মে মাসে বি, বি, সি (বিট্রিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন)-তে দেয়া 'কেন আমি বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি' শীর্ষক এক বক্তৃতা প্রচারিত হয়। এই বক্তৃতায় তিনি বল্লেন, আমি তিনটি নীতির জন্য বৌদ্ধধর্ম পছন্দ করি। প্রথমটি হল প্রজ্ঞা (অলৌকিক ও কুসংস্কারে বিরুদ্ধে যুক্তিসংগত জ্ঞান) দ্বিতীয়টি হল- করুনা (প্রেম অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীর প্রতি ভালবাসা) এবং তৃতীয়টি হল সাম্য (সমতা অর্থাৎ সমস্ত মানুষকে সমান মনে করা।

জুন মাসের দিকে ডঃ আম্বেদকরের শারীরিক অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে গেলে জনৈক ফরাসী মহিলা ডাক্তর ডঃ আম্বেদকরকে কসমিক রেডিয়েশন। নীতির উপর ভিত্তিকরে চিকিৎসা করানোর পরামর্শ দেন। এতে তাঁর অক্ষম পেশী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ সচল হবে বলে জানালেন। কিন্তু শ্রীমতি আম্বেদকর উক্ত মহিলা ডাক্তারের পরামর্শ গুরুত্ব না দেওয়ায় কসমিক রেডিয়েশন করানো সম্ভব হয়নি। একারণে আম্বেদকর স্ত্রীর উপর ক্ষুদ্ধও হয়েছিলেন।

আগামী ১৪ই অক্টোবর বিজয়া দশমীর দিনে বেলা ৯টা থেকে ১১ টার মধ্যে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ শাস্ত্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পন্ডিত নাগার্জুনের জন্মস্থান নাগপুরে দীক্ষা পর্ব সম্পন্ন করবেন বলে ২৩শে সেপ্টেম্বর প্রচারিত প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হল। দীক্ষাদানের জন্য ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানালেন গোরক্ষপুরের কুশীনারাতে অবস্থানরত অশতিপর বৃদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু চন্দ্রমনিকে। কলকাতা মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক ডি, বলিসিনহাকেও দীক্ষানুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন। তাছাড়া তাঁর অসংখ্য গুনগ্রাহী, অনুগামী যারা তাঁর সংগে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করতে একান্ত ইচ্ছুক তাঁরাও যেন উক্ত দিবসে পরিচ্ছন্ন শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে নাগপুরে উপস্থিত হন সেজন্য তাদের প্রতি আবেদন জানালেন।

দীক্ষা দিবসের তিনদিন পূর্বে সস্ত্রীক আম্বেদকর ও একান্ত সচিব রত্তুকে নিয়ে নাগপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দিলেন। সেখানে তাঁরা 'সাম' হোটেলে ওঠেন। ইতিমধ্যে অজস্র লোক সেখানে জড়ো হয়ে গেছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ করে বোম্বাই, মধ্য প্রদেশ ও বেরার থেকে পিঁপড়ের সারির মত অগনিত লোক ট্রেনে, বাসে অথবা পায়ে হেঁটে নাগপুরের উদ্দেশ্যে আসতে থাকে। 'বুদ্ধ কি জয়', 'বাবা সাহেব কি জয়'- এ দুটি শ্লোগানে শ্লোগানে সারা নাগপুর মুখরিত। নাগপুর যেন আবার প্রাচীন গৌরবে গৌরান্বিত হয়ে উঠল।

নাগপুরের শ্রদ্ধানন্দ পেটের উপর ১৪ একর জায়গা নিয়ে তৈরী করা হল ঐতিহাসিক দীক্ষাভূমি। উত্তর দিকে শ্বেতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য আলাদা দুটি মঞ্চ তৈরী করা হল। দুটি মঞ্চের মাঝখানে সাঁচিস্তুপের মডেলে তৈরী করা হল একটি স্তুপ। চারিদিক সুশোভিত হল বৌদ্ধ পতাকায়। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শত শত সদস্যদের হিমসিম খেতে হচ্ছে আগত লোকদের সামাল দিতে।

১৩ অক্টোবর আহুত প্রেস কনফারেন্সে ডঃ আম্বেদকর জানালেন, 'আমি যে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে যাচ্ছি তা হবে আধুনিক সমাজ জীবনের ভিত্তিতে বৌদ্ধধর্মের এক নবতর রূপ, যার নাম হবে নবযান। আমি বিগত ৩০ বছর ধরে হিন্দুধর্মকে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে গড়ে তোলার আন্দোলন করে আসছি। কায়েমী স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী হিন্দুধর্মের স্তরে স্তরে অসাম্য বজায় রেখে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির মতলব ত্যাগ না করাতে বাধ্য হয়ে

অনুগামীদের নিয়ে আমাকে হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করতে হচ্ছে এবং অন্য কোন ধর্মের চেয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলে ভারতীয় সংস্কৃতিই অটুট থাকবে বলে আমি মনে করি।'

১৪ই অক্টোবর সকাল সাড়ে আটটায় শ্বেতবস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে আম্বেদকর, তাঁর স্ত্রী ও একান্ত সচিব দীক্ষাভূমি অভিমুখে পদার্পন করলেন, সকাল ৯ ঘটিকায় তিনি যখন ডায়াসে ওঠে তাঁর একান্ত সচিবের কাঁধে হাত রেখে অন্য হাতে তাঁর লাঠিটি উচু করে ধরলেন তখন লক্ষ কণ্ঠের আনন্দ ধ্বনিতে সারা নাগপুর শহর প্রকম্পিত হয়ে উঠেছিল। মারাঠি ভাষায় রচিত এক প্রশস্তি সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। ৮৩ বৎসর বয়স্ক ভিক্ষু চন্দ্রমনি মহাস্থবির তাঁদের দীক্ষাকার্য সম্পন্ন করলেন। একই সময়ে ৫ লক্ষাধিক জনতা বৌদ্ধধর্ম গ্রহন করে নবজন্ম লাভ করলেন। পরের দিন একই দীক্ষাভূমিতে এক লক্ষাধিক জনতা দীক্ষা গ্রহন করলেন। ১৬ই ডিসেম্বর চান্দাতে বিশাল জনতাকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করে তিনি দিল্লী অভিমুখে রওনা হন। ধর্মান্তরের কারণে ভারতের কোন নেতৃবর্গ তাঁকে অভিনন্দন না জানালেও বিশ্বের অনেক দেশ ও নেতৃবর্গের কাছ থেকে তিনি অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

এরপর সারা ভারতব্যাপী ধর্মদীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করার এক ব্যাপক কর্মসূচী তিনি হাতে নেন। এদিকে তাঁর স্বাস্থ্যের ক্রমাবনতি হলে সেই কর্মসূচী পরিচালনা করা তার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। তবুও ১৫ই নভেম্বর নেপালে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি সস্ত্রীক গমন করেন। সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম ও কাল মার্কসের উপর গবেষনা মূলক ভাষণে বৌদ্ধ ধর্মের শ্রেয়তর পথগুলো সুক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করেন। এটাই তাঁর জীবনের শেষ বৌদ্ধধর্ম প্রচার।

# জীবনাবসান

বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা উত্তর ১৯৫৬ সালের ৩০শে নভেম্বর নেপালে অনুষ্ঠিতব্য ৪র্থ বৌদ্ধ মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য আমন্ত্রন পান। ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়ে তিনি সস্ত্রীক নেপালে গমন করেন। সম্মেলন শেষে দেশে ফিরে আসার পর দীর্ঘ ভ্রমণ ও পরিশ্রমে শারীরিক অবস্থা সাংঘাতিক অবনতির দিকে চলে যায়। ঐ সময় তাঁর অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত একান্ত সচিব রত্তুকে সব সময় কাছে থাকার জন্য বল্‌তেন এবং তাঁর শশুর, শ্যালক ও অনান্য আত্মীয় স্বজনেরাও দিল্লীস্থ তাঁর বাড়ীতে এসে্ সর্বদা তাঁকে দেখাশুনা করতেন। জীবনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর অনেক আগেই তাঁর স্বাস্থ্য এভাবে ভেঙ্গে পড়াতে তিনি গভীর বিষন্নতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলেন। এখন আর তাঁর পক্ষে একাকী চলা ফেরা করাও সমম্ভব হচ্ছে না।

এমন পরিস্থিতিতে কিছুটা সুস্থবোধ করলে ২রা ডিসেম্বর অশোক পার্ক বিহারে তিনি ভারতে নির্বাসিত তিব্বতীয় ভিক্ষু দালাইলামার সাথে একান্ত সাক্ষাতকারে মিলিত হন। পর দিন তাঁর বাড়ীর লনে বসে অনেকের সাথে গল্প গুজব করেন এবং শ্বশুর, শ্যালক, পত্নী ও ডঃ মালঙ্করের সাথে একটি গ্রুপ ছবিও তোলেন। তাঁর বাগানের মালীর অসুস্থতার খবর পেয়ে রত্তুর কাঁধে ভার রেখে মালীকেও দেখতে যান এবং বাসায় ফিরে এসে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে বসে বসে কার্লমার্ক্সের বিখ্যাত "দাস ক্যাপিট্যাল"র উপর চোখ বুলোচ্ছেন এবং সেদিনই 'বুদ্ধ ও তার ধর্ম' গ্রন্থখানির শেষ অধ্যায়ের লেখা সম্পূর্ণ করে পরের দিন রত্তুকে টাইপ করতে দিলেন।

৪ঠা ডিসেম্বর তিনি রাজ্যসভার অধিবেশনে যোগদান করলেন। সেদিন হয়তো কেউই ঘুর্ণাক্ষরেও উপলব্ধি করতে পারলেন না যে ডঃ আম্বেদকরের মত এমন এজন প্রতিভাবান সাংসদের উপস্থিতি রাজ্য সভায় আর দেখা যাবে না। ঐ দিন বাসায় ফিরে সন্ধ্যায় সিদ্ধান্ত হল যে, আগামী ১৬ই ডিসেম্বরে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিতব্য দীক্ষা সমারোহে যোগদানের উদ্দেশ্যে ১৪ই ডিসেম্বর অসংখ্য শুভানুধ্যায়ী ও অনুগামীসহ বোম্বাই রওনা দিবেন।

৫ই ডিসেম্বর রাত ৮টায় কয়েকজন জৈন নেতা ডঃ আম্বেদকরের

সাক্ষাত প্রত্যাশায় এসেছিলেন। তাঁরা প্রথমে আম্বেদকরের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইলেন এবং উভয়েই বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করতঃ 'জৈন ও বুদ্ধ' নামক একটি পুস্তিকা তাঁর হাতে হস্তান্তর করেন এবং পরদিবসে জৈনদের একটি সভায় উপস্থিত থাকার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ জানালে তিনি স্বাস্থ্যগত অবস্থা বিবেচনা করে ধর্মসভায় যোগদানের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করেন। এঁরা বিদায় নেওয়ার পর থেকে রত্তু তার প্রিয়তম প্রভূর সেবা শুশ্রুষায় নিমগ্ন হলেন এবং রাত্র প্রায় ১১টা নাগাদ তাঁর পাশে থেকে বিভিন্ন ভাবে তাঁকে (ডঃ আম্বেদকর) সহায়তা করেছেন। কখনও মালিশ লাগিয়ে কখনও সময়মত ঔষধ পত্র সেবন করাইয়ে। এদিকে রত্তু আগের দিনও নিজ বাসায় ফিরতে পারেননি তাই বাসায় যাওয়ার জন্য যেমন উদ্বিগ্ন তেমনি প্রচন্ড ক্ষুধাও বোধ করছিলেন। আম্বেদকর রেডিওগ্রামে তাঁর একটি প্রিয় ধর্মীয় সংগীত শুনানোর জন্য রত্তুকে জানালেন এবং তাঁর প্রিয় কয়েকটি পুস্তক টেবিলের উপর রাখার জন্য বললেন। এরপর গুনগুন করে 'বুদ্ধং শরনং গচ্ছামী' গাইতে গাইতে ডঃ আম্বেদকর নিদ্রামগ্ন হলে রত্তু বাড়ী ফিরলেন।

৬ই ডিসেম্বর ভোর বেলা শ্রমতি আম্বেদকর স্বামীর শয়ন কক্ষে এসে তাঁকে জাগাতে গিয়ে বুঝতে পারলেন যে, তাঁর প্রিয়তম স্বামী এবং ভারতের লক্ষ লক্ষ শোষিত, বঞ্চিত, অবহেলিত ও নির্যাতিতদের পরম প্রিয় মানুষটি ইহ জগতে আর নেই। তৎক্ষণাৎ তিনি গাড়ী পাঠিয়ে রত্তুকে নিয়ে এলেন। রত্তু ও শ্রীমতী আম্বেদকর কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

এরপর রত্তু ফোন করে আম্বেদকরের ঘনিষ্ট জনদেরকে এই দুঃসংবাদ জানালে অল্পক্ষণের মধ্যে অগণিত শোকাতুর জনতার পদভারে ডঃ আম্বেদকরের নিউ দিল্লীর ২৬নং আলীপুর রোডের বাড়ীর আঙ্গিনা ভারী হয়ে উঠল। মৃত্যু সংবাদ দাবানলের মত দ্রুত সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর বাড়ীতে ছুটে এলেন প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, যোগাযোগ মন্ত্রী জগজীবন রামসহ অনেক শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবর্গ। সেদিন রাত্রে তাঁর মরদেহ বোম্বাই নিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত হল। যোগাযোগ মন্ত্রী স্পেশাল প্ল্যানের ব্যবস্থা করলেন তাছাড়া প্রধানমন্ত্রী তাঁর অন্ত্যোষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন করার জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিলেন।

অপরাহ্নে বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তাঁর মরদেহ পালাম বিমান

ঘাটিতে যাত্রাকালে লোকসভা ও রাজ্যসভার সদস্যবৃন্দ ও উর্ধ্বতন সরকারী কর্মকর্তারা ভারত রত্নের শবদেহে অসংখ্য পুষ্পমাল্য ছড়িয়ে দিলেন। রাত্র ৯-৩০ মিনিটে প্ল্যান বোম্বাইয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। সাথে ছিলেন শ্রীমতি আম্বেদকর, একান্ত সচিব রত্তু, শঙ্করানন্দ শাস্ত্রী, ভিক্ষু আনন্দ কৌশল্যায়ন, শঙ্করলাল শাস্ত্রী, পাচক সুদামসহ আরো অনেকেই। রাত ৩টায় বোম্বাইয়ের সান্তাক্রুজ বিমান বন্দরে পৌঁছলে সেখানে অপেক্ষমান লক্ষ লক্ষ অনুগামীরা শোক মিছিল সহকারে আম্বেদকরের বাস ভবন 'রাজগৃহে' নিয়ে গেলেন। পরদিন সারা বোম্বাই শহরের সমস্ত অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, দোকানপাট, কল-কারখানা বন্ধ হয়ে গেল।

মাথার উপর বুদ্ধের করুনা বিগলিত মূর্তি সম্বলিত ডঃ আম্বেদকরের মরদেহ একটি সুসজ্জিত লরীতে নিয়ে ১-৩০ মিনিটে প্রায় ৪ লক্ষ জনতার বিশাল শোভাযাত্রা ভিনসেন্ট রোড, পোইবারদী, এলফিনষ্টোন ব্রীজ, সয়ানী রোড এবং গোখেল রোড ধরে দাদার শ্মশান ক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছল। ঐ সময় বোম্বাই শহরে যানবাহন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিটে ডঃ আম্বেদকরের একমাত্র সন্তান যশোবন্তরাও আম্বেদকর শ্মশানে মুখাগ্নি করলেন। শোকার্ত লক্ষ জনতার ক্রন্দন ধ্বনিতে দাদার শ্মশান ভূমি এলাকার বাতাস ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। প্রিয় নেতার শেষ ইচ্ছে পূর্ণ করার মানসে ঐদিনই দাদার শ্মশান ঘাট এলাকায় লক্ষাধিক জনতা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা নিলেন।

ডঃ আম্বেদকরের আত্মার সৎগতি কামনা করে প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর প্রস্তাবে লোকসভা ও রাজ্যসভা একদিন বন্ধ ঘোষনা করা হয়। পরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ আম্বেদকরের জন্ম দিনকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষনা করেন।

এদিকে ডঃ আম্বেদকরের মৃত্যু অস্বাভাবিক বলে তাঁর অনুগামীদের এক বিশাল অংশ অতি মাত্রায় সন্দেহ প্রবণ হয়ে উঠেছেন। তাঁর মৃত্যুর ১১দিন পরে অনুষ্ঠিত শোক সভায় তাঁরা ডঃ আম্বেদকরের মৃত্যুর কারণ উদঘাটন করার লক্ষ্যে তদন্ত কমিটি গঠনের জন্য সরকারের কাছে জোর দাবী জানান। শেষাবধি পুলিশী তদন্তে তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটেছে বলে রিপোর্ট দেয়।

ডঃ আম্বেদকরের স্মৃতি চারণ করতে গিয়ে প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বল্লেন- 'ডঃ আম্বেদকর ছিলেন হিন্দু সমাজের সমস্ত প্রকার নিপীড়নের বিরুদ্ধে একটি বিদ্রোহী সত্তা।' রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেন। 'ডঃ আম্বেদকর যেমন আমাদের সংবিধানের রূপকার তেমনি ভারতের বঞ্চিত ও নির্যাতিত শ্রেণীর অন্যতম মুক্তিদাতা।'

ডঃ আম্বেদকরের প্রতিভার মূল্যায়ন করে শেষ করে যাবে না, বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এই ব্যক্তিটি একাধারে অনুন্নত ও শোষিত মানুষের সর্বোত্তম ত্রানকর্তা, মহানুভব শ্রমিক নেতা, নারী স্বাধীনতার সোচ্চার কণ্ঠ, দুঃসাহসী সমাজ বিপ্লবী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদী, ভারত তথা বিশ্বের নিপীড়িত জনতার মুকুটহীন সম্রাট, জ্ঞানের অথৈই সাগর, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, সমকালীন বিশ্বে শ্রেষ্ঠ মেধা সম্পন্ন বুদ্ধিজীবী কয়েকজন পন্ডিতদের অন্যতম।

তার মৃত্যুতে বিশ্ববাসী হারাল এক মহান গণতন্ত্রী ও মানবাধিকারের প্রবর্তককে, ভারতের রাজনীতির আকাশ থেকে খসে পড়ল একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক যিনি সমগ্র হিন্দু সমাজকে নূতন করে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে গড়ে তুলতে এবং নারী পুরুষের সৈমমোর অবসানের মাধ্যমে চেয়েছিলেন। যার একক প্রচেষ্টায় হাজার হাজার বছরের অত্যাচারিত, বঞ্চিত, শোষিত ভারতের কোটি কোটি মানুষকে মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠাপূর্বক প্রকৃত গণতন্ত্রের সূচনা করতে আমৃত্যু দুষ্কার সাথে যেতে হয়েছিল। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু কোটি কোটি অবদমিত জাতি কে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েনি এককালের বৌদ্ধ ধর্মের পাইকার বৌদ্ধ ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের পুনর্জাগরনের আশু সম্ভাবনাও স্তিমিত হয়ে পড়ল।

১৯৯০ সালে তাঁর মৃত্যুর ৪৪ বছর পর ভারত সরকার তাঁকে মরনোত্তর ভারত রত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। বিলম্বে হলেও সরকারের বোধোদয় হয়েছে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিতে।

## সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা
- রনজিৎ কুমার সিকদার
(পশ্চিম বঙ্গ)

২। Jagajjyoti
Dr. Babasaheb Ambedkar
(Birth Centenary Volume-1991)
– Edited by
Hemendu Bikash Cowdhury
(West Bengal)